উত্তরণ

শারদ সংখ্যা

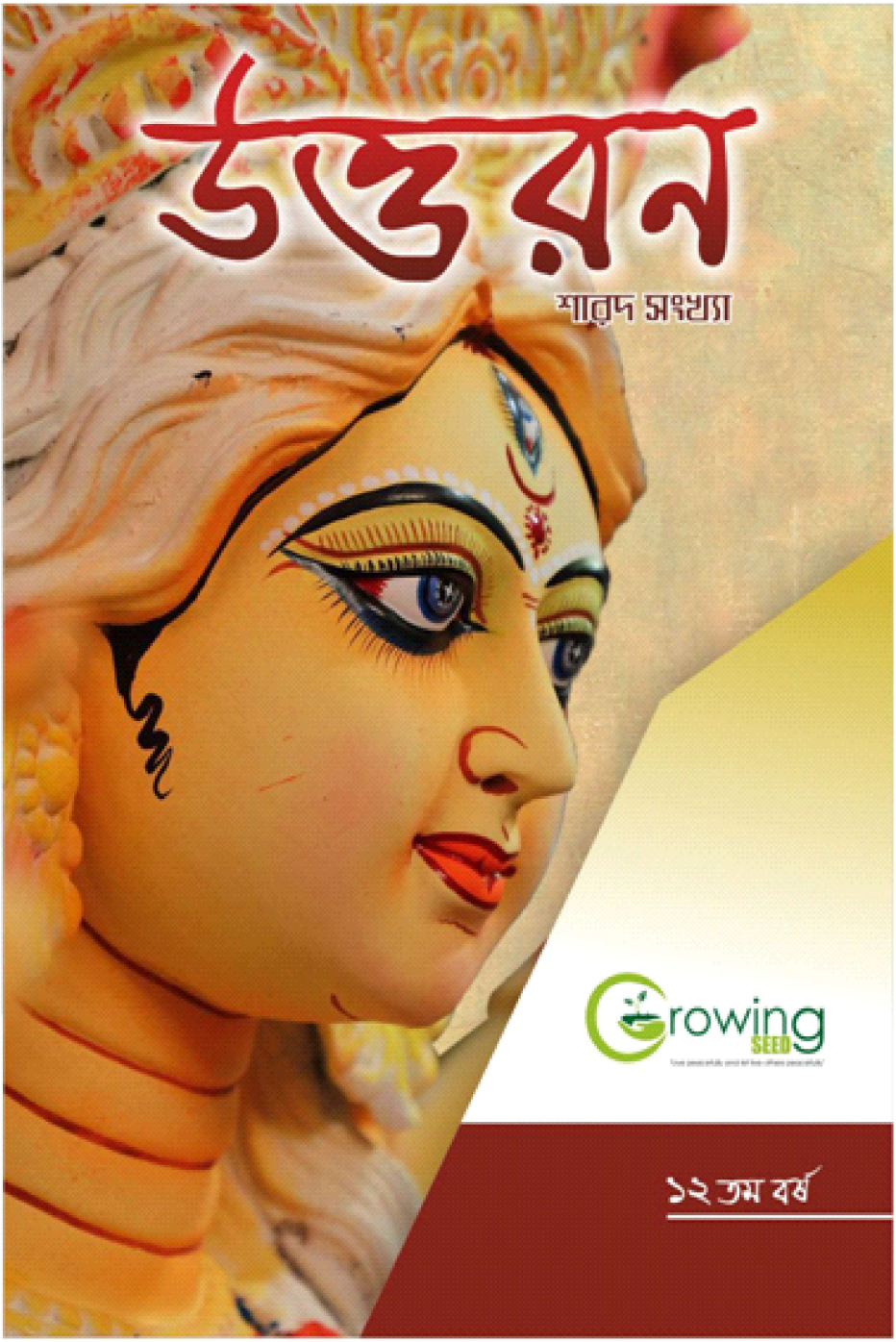

Growing SEED

১২ তম বর্ষ

উত্তরন্

শারদ সংখ্যা - ২০২২

Growing Seed, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা

লগঅন করুন : www.growingseed.in
ই-মেল : seedgrowing@gmail.com
ফেসবুক : facebook./growingseedinfo
টুইটার : @growingseed1
ইউটিউব : Growing Seed
ইনষ্টাগ্রাম : growingseed1

(বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোনো দায় ম্যাগাজিন কর্তৃপক্ষের নয়।)

UTTARAN
Edited by : Growing Seed
Rs. 40

দ্বাদশ প্রকাশ ঃ
০১-১০-২০২২

প্রকাশ ঃ
Growing Seed Printing Unit
চন্দ্রপুর, ধর্মনগর, উঃ ত্রিপুরা।

অক্ষর বিন্যাস ঃ
দিপঙ্কর দেবনাথ (মোঃ 9436576387)

প্রাচ্ছদ ঃ
অনুপম ভট্টাচার্য্য
Haploids advertising
Vadodara, Gujarat

মূল্য ঃ
৪০ টাকা মাত্র

সম্পাদকের কলমে

বৈশ্বিক মহামারির হাহাকার ও মৃত্যু মিছিল কি এখন অতীত হয়েছে নাকি সাময়িক বিরতি নিয়েছে তা এখনো পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। কিন্তু এটা বেশ প্রতীয়মান হচ্ছে যে বিগত দুই বৎসরের তুলনায় এই বৎসরের শারদীয়া উৎসব অনেকটাই রঙিন ও উদ্দীপিত ভাবে হতে চলেছে। তো কথা হচ্ছে করোনা মহামারী ক্লান্ত হলেও আমাদের সমাজে চুপি চুপি ঢুকে পড়ছে আরো সব অদৃশ্য মহামারী। এই যেমন ধরুন ধর্মীয় সংকীর্নতা, রাজনৈতিক উন্মাদনা, ক্রমবর্ধমান সামাজিক ও মানবিক দুরত্ব এবং মেধাব অবমুল্যায়ন। এর ভ্যাকসিন কবে আসবে ? বিশ্বের আপামর গবেষক ও বৈজ্ঞানিকদের নিরন্তর প্রয়াস আর নানা পেশার মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে রেকর্ড সময়ের মধ্যে করোনার মতো মহামারীকে কাবু করা গেছে। মনুষ্য প্রচেষ্টায় অসাধ্য সাধনের এরকম নজীর দেখে স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে সমাজের নানা স্তরে ছড়িয়ে থাকা বিকৃতি এই একই উদ্যমে অপসারিত করা যায় না ? এই প্রশ্ন বারংবার উঠতেই থাকবে; উত্তর খোঁজার প্রচেষ্টাও নিরন্তর চলতেই থাকবে। তাই বলে তো আর গরিবের সাহিত্যচর্চা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না! বিধায়, আমাদের ক্ষীনকায়া দরিদ্র বাৎসরিক ম্যাগাজিন এবারও উপস্থিত শারদীয়া সংখ্যা ২০২২ নিয়ে। আমরা উত্তরন কর্তৃপক্ষ বরাবরের মতো এবারও কৃতজ্ঞ যারা আমাদের এই ক্ষুদ্র ম্যাগাজিন গল্প, কবিতা ইত্যাদি পাঠিয়েছেন। পাঠকগন, কৃতজ্ঞতা জানাই আপনাদেরকেও, যারা নিজেদের মুল্যবান সময় থেকে কিছু সময় ব্যয় করে প্রতিবছর আমাদের এই ক্ষুদ্র ম্যাগাজিনে চোখ বুলান।

বিনীত

সম্পাদক / প্রকাশক

Growing

Complete Printing and Designing Solution

—ঃ সূচীপত্র ঃ—

বিষয়	লেখকের নামে	পৃষ্ঠাঙ্কে
দেওয়ান-ই-আম	বিধান চন্দ্র দে	১
তোমার জন্য.....	অভিজিৎ চক্রবর্তী	৪
প্রত্যাবর্তনে হঠাৎ দেখা	সুপর্ণা ভট্টাচার্য	৫
ভিক্ষে-মা	দিকশুন্যপুরের অভিযাত্রি	৭
খট্ খট্ খট্ (২)	অঙ্কিতা দেবনাথ	১৮
হরিণজন্ম	লিটন শব্দকর	১৯
অনুভূতির সঞ্চয়	সঞ্চয়িতা নাথ	২০
সঙ্গী	সুদীপ্ত চক্রবর্তী	২১
আত্মঘাতী	অনিন্দিতা দেবনাথ	২৩
সূর্যমুখী	দেবারতি চন্দ রায়	২৪
মেরুদণ্ড !	নীলোৎপল গোস্বামী	২৫
গল্পের শহর	শেখর দেব	২৬
ফসলেন সংস্থিতা	দেবাশিস সায়ন	২৬
৯ শুধু ৯ নয়	পুষ্পা দাস	২৭
অপেক্ষা	রাজর্ষি ভট্টাচার্য	২৯
সোনার হরিণ	সৌম্যদীপ চক্রবর্তী	৩১
তোমার বাসা	শম্ভু শংকর চক্রবর্তী	৩১
অন্য দুর্গা	সপ্তদীপা দেবনাথ	৩২
স্বপ্ন	মাম্পি দে	৩২
প্রকৃতির কোলাহল	দেবত্র ভট্টাচার্য্য	৩৩
কিস্তি মন	দেবজ্যেতি আচার্য্য	৩৩
এই জীবৎকালে	মিতালী দে	৩৪
মানসিক শান্তি	দীপালোক ভট্টাচার্য্য	৩৪
লৌহ মানব বল্লভভাই ও অক্টোবর	রণজিৎ পুরকায়স্ত	৩৫

AGRIALLIS

Science for Agriculture and Allied Sector: A Monthly e Newsletter

A National Level Peer Reviewed e Magazine
on
Agriculture and Allied Sciences.

An Initiative Supported by

GROWING SEED

www.agriallis.com

দেওয়ান-ই-আম

- বিধান চন্দ্র দে

সূর্য্য আখি মেলে তাকাতেই ভোর হলো। ক্রমশ ভীড় বাড়তে বাড়তেই মানুষের জটলা। কেমন জনতার দরবার ! যেমনটা বসতো রাজা-মহারাজাদের আম দরবার, সভা সন্দর্শন। সুলতান-বাদশা-সম্রাটের দেওয়ান-ই-আম !

অনেক প্রবৃদ্ধ-নুব্জ-কুব্জ 'সিনিয়র সিটিজেন' এলেন ! এঁদের ঝাপসা ঘোলা চোখ দৃষ্টি শক্তি !
সাদা চুল দাঁড়ি গোফ
ঈষৎ উস্কো খুস্কো,
শরীরের খাঁজে ভাঁজে প্রায় শতাব্দীর
ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন।

দু'হাতে পিছুটান সরিয়ে সরিয়ে
ঠিক সাতাঁর কাটার ভঙ্গিতে আরো এলো
যুবা পুরুষ নর-নারী
অনেক মুখ এসে জড়ো হলো-
রোদ - বৃষ্টি মেখে।
অনেক চোখ এসে বিশ্বাস - অবিশ্বাসের পেন্ডুলাম দন্ডের মতন দুলতে থাকলো।

মৃদু গুঞ্জনের মধ্যে ঘর থেকে এলেন অধিনায়ক জন-গণ-মন....
পলকহীন ভাবে তার দিকে সবার দৃষ্টি-
সবাই তার অচেনা মুখে একটুও চেনা ছাপের অন্বেষনে হালকা আসমানি নকশী পাঞ্জাবী ধবধবে সাদা পাজামা গলে গৈরিক উত্তরীয় পরিহিত সৌম্য ব্যক্তিত্ব।

কে আগে কথা বলবে ! ?-
একান্ত নিজ কথা, তর সয় না।
ঠেলা ধাক্কার মধ্যেও কেমন লজ্জা-লজ্জা ভাব জন্ম জন্মান্তরের প্রস্তর প্রতীম আড়ষ্টতা।
প্রথম আসা ছেলেটাকে 'সিকিউরিটির' লোকেরা সুযোগ দিল
রোগা পাতলা ক্ষীনকায় যুবক কিছুই বলতে পারলো না,
এগিয়ে দিলো একটা কাগজ-
না, কাগজ না, কিছু অক্ষর
অক্ষরও না-সিঁড়ি !
এম.এ পাশ করতে গেলে যতগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিঁড়ি পেরোতে হয় ঠিক ততগুলি সিঁড়ি !!
যুবক হাটু মুড়ে বসে রইলো সারমেয় শাবকের মতন প্রত্যাশীর পদতলে, যতক্ষণ না তার সারমেয়

স্বরূপ প্রকটিত না হচ্ছে।..... ভোক্ষন - ভোক্ষন- তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে একই সঙ্গেঁ যুবকের - 'ন্যায্য প্রাপ্তি', 'মৌলিক অধিকার' আর 'দারিদ্র্যতার পরিমাপ' করে নিলেন- অধিনায়ক !!
ঠিক পাবেন-সব পেয়ে যাবেন
ধৈয্য ধরুন-বিশ্বাস রাখুন
'সবুরে মেওয়া ফলে'..।

অনেকেই মনের কথা, প্রাণের ব্যথা বললেন।
শোনানোর চেষ্টা করলেন
যতটুকু যার বলার ছিল
অনেকেই আশা করেছিলেন,- সে
শিরডির সাঁই বাবার মতন শূন্যে হাত ঘুরিয়ে
তক্ষুনি তক্ষুনি এনে দেবে হাওয়া থেকে
হারিয়ে যাওয়া সব পাওনা,-

তবু তার অভয় মন্ত্রে এমন সহজ সত্যের দৃঢ়তা
যে মুখের ওপর অস্বীকার করা যায় না
শূন্যতার মধ্যেও যেন ফুল ফুটছে,
গুমোট গরমে মেঘলা আকাশে উড়ে গেল
কিছু পাখি-
নীরবে নিঃশব্দে-

দেওয়ান-ই-আম,
বা জনতার দরবারের স্বাক্ষী রাইলো
একটি কামরাঙ্গাঁ গাছ আর অজস্র পাতা !
শুধু জনা আষ্টেক যুবক ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল
ওরা কিছু জানালো না।
ওদের জানানোর মতন ভাষা ছিল না,
এ মনই এক নিঃস্বতা যে,
এই ব্রহ্মান্ডের কোনো কিছুতেই ওদের আগ্রহ নেই
ওদের নতচক্ষু অন্তরে আন্দরে কাঁদছে বোধ হয়
কেউ কারো দিকে তাকাচ্ছে না
পাশাপাশি দাঁড়িয়েও ওরা একা-একলা।

ওদের কী কোনো দাবী আব্দার নেই
ওদের কান্নাও নেই,
না, বাতাস ছাড়া কেউ ওদের কান্না শুনতে পায় না

ওদের প্রত্যেকের প্রাপ্তি - অপ্রাপ্তির নিজস্ব তীব্রতা এক নয় !!

তেত্রিশ কোটির পরেও আরও একশ তেত্রিশ কোটির একজন
আরো নিঃশব্দ নিস্তব্ধ কয়েকজন এখনও আসে
তারা আর কামরাঙ্গাঁ গাছ তলায়ও যায় না
যারা 'তিন সত্যি' অর্থাৎ এক সাথে - এক বিশ্বাসে
এক প্রগতিতে গিয়েও অশ্রু সিক্ত নয়নে
চেয়ে থাকে সুন্দর সোনালি দিনের পানে গভীর অপেক্ষায়
ক্রমশ শুকিয়ে যেতে থাকা পৃথিবীর ভালোবাসার অপেক্ষায়
আসলে মানুষ সারাজীবন জানলই না
সত্যি সত্যি সে কী হারিয়েছে আর কী পেয়েছে-
অথচ আজও 'দেওয়ান-ই-আম' বসে
'জনতার দরবার' হয়।

মাঝ বয়েসী,
খানিক স্থূলো গোল মতো মহিলা
গালে ব্রন মেছেতার দাগ বড় স্পষ্ট
চুল কালো কার্ল শট,
সাষ্টাঙ্গে প্রনত হয়ে ক্ষীন স্বরে যা বললেন বোধগম্য হলো না.....
আসলে মনে হয় মেয়েরা পেটে রেখে কথা বলে !

এবার কথা বলার পালা প্রশ্ন বোধকদের-
একজন বললেন- হে মহাত্বন,
অপর জন - ধর্মাবতার, ত্রৈলোক্য স্বামীর মান মন্ডপের নাট মন্দিরের নিমিত্ত.....
অন্যজন সুখের ভাষা কেড়ে নিয়ে আর্শীবাদের ভঙ্গিতে ফোকলা দাঁতে 'সংস্কৃত' মন্ত্র আউড়ালেন-
অধিনায়কের-তর্জ্জনী উর্ধে উঠলো-
জানি, জানি - জানি সব জানি-

*****

তোমার জন্য

- অভিজিৎ চক্রবর্তী

আবার ফিরে অন্ধকারে তোমার জন্য পয়ার লিখছি
আবার আমার বুকের ভেতর একতারাটির সুর খুঁজছি

আবার এমন বর্ষাকালে ইচ্ছে হচ্ছে হারিয়ে যাই
আবার চোখে একলা ময়ূর ঘুরছে হাওয়ার বিরুদ্ধতায়

তুমি যে কে তুমি যে কি আমায় কেন বলছ না
আমার কথায় আমার লেখায় কেন যে তুমি আসছো না

পিঁপড়ে হয়ে শব্দগুলি নেমে পড়ছে উঠোন জুড়ে
আমার অনেক না জানা ক্ষোভ অনেক লোভের রাস্তা ধরে

বাজার থেকে শশ্মান হয়ে মিছিল ঘুরে ড্রইংরুমে
শিথিল পয়ার নদীর মতন খুঁজছে তোমায় মধ্যযামে

আমার পাঁজর আমার মগজ গলে পড়ছে মোমের ধারা
বৃষ্টিছাঁটে ধুয়ে যাচ্ছে সকল আড়াল সকল তারা

তোমায় যেথায় লুকিয়েছি যেথায় তোমার থাকার কথা
কোথাও নেই কিছুই নেই কেবল মহাশূন্যতা

ডাকছি তোমায় অন্ধকারে দরজা জানলা সপাট খুলে
যদি বা আসো যদি বা থাকো লেখার গভীর গোপন সেলে

আমায় তখন বাইরে থেকে কেউই আর চিনবে না
হাতে শস্ত্র পায়ে অশ্ব শিরস্ত্রাণে চন্দ্রমা ।

*****

প্রত্যাবর্তনে হঠাৎ দেখা

- সুপর্ণা ভট্টাচার্য

সমাজবিধির পথ গেলো খুলে,
পর-পর সমস্ত তাসের দেশ
এক নিমিষে চোখের আড়ালে মেঘ জমালো,
বৃষ্টি হবার মন্ত্র বহুকাল হলো তারা ভুলেছে অমিত।

ট্রেন ইঞ্জিনের কালভেদি শব্দ
অনেক অভিমান-রাগ-অভিনয়কে চাপা দিয়ে
যে লৌকিকতার প্রসন্নতা-তাতে তুমি চিরকালই পটু;

কালো রেশম ঢাকা লাল'ক্ষত হৃদয় সেদিন অন্তরালে ছিল,
দালিম রঙের সেই শাড়ির সাথে আমার আলমিরায় বহু চেনা ভালোবাসা আগের মতোই অমলিন রয়ে গেছে
এই দিগন্ত সরষেখেতের মতোই তারা চিরসুশোভন।

জানতে চেয়েছো আমার কথা-সংসার ইত্যাদি ইত্যাদি
এই আলাপের সুরে বিগত দিনের বহু চেনা বিবাদী সুর মিশে গেলো এই রেল গাড়ির কামড়ায়।

হাতের অস্থিরতা'র চেনা বাচনভঙ্গি তোমার জানা মিতা,
তবু কেন এতো কথা !
এর চেয়ে ঢের ভালো চুপ করে থাকা;
অনুভব করো নিঃশব্দের প্রতিটি কোলাহল
যে কোলাহল জমাট বেঁধে রেখেছে অনেক প্রশ্নকে;

বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়েই তাই শুধলোম,

"আমাদের গেছে যে দিন
একেবারেই কি গেছে,
কিছুই কি নেই বাকি।"
চুপ রইলে;

ঠিক আগের মতোই গুছিয়ে কথা রাখার সে তোমার চিরকালের অভ্যেস,

“রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে -”

উত্তম সখা ! এবারও তোমার কথার জয় হলো,
কিন্তু বলতে ভুলে গেলে
তারা’রাও খসে
এক তারা’র মৃত্যু হয়ে জন্ম হয় কত শত।

স্টেশন আসলো
আমায় নামতে হলো,
তোমার ট্রেন আবার ছাড়লো
নতুন কোনো গন্তব্যের দিকে,
ঠিক আগের বারের মতো এবারও যেতে দেখলাম;

ট্রেনের শেষ যে অংশ আকাশের ওই দিগন্তে মিশে গেলো,
ওই কোণে একটি ধ্রুবতারা-

দিনের আলোর গভীরে রাতের সকল তারা লুকিয়ে যায়,
শুধু এক ধ্রুবতারাই ঊষার প্রকাশে আরও স্পষ্ট হয়,
তার শুরু নেই
তার শেষ নেই
ঠিক যেন অমিত-লাবণ্য।

*****

ভিক্ষে-মা

- দিকশুন্যপুরের অভিযাত্রি

"মাগী আঁটকুড়ি বেটি আবার এই দিকে ছোঁক করছে দেখো না! অমন লুভিষ্টে দশা না হলে কি আর এমন কপাল হয় ? তবু তো চোখগুলো যেতে বসেছিল, তাও শিক্ষে নেই গা !"

ঠাকুরঘরের দরজায় বসে আমুদী গয়লানীর সদ্য রেখে যাওয়া ঘিয়ের হাঁড়ির মুখ থেকে শালপাতা আর পাটের দড়ির বাঁধন এক টানে খুলে এক কোণে ফেলে বড় কাঁসার গামলা ভর্তি ময়দায় তার থেকে কিছুটা ঢালতে ঢালতে হিসহিসিয়ে বলে উঠলেন তাপসী মাসিমা। লক্ষ্যটি আর কেউ নয়, এই গাঙ্গুলী বাড়িরই কর্তাদের জ্ঞাতি বোন রাণী পিসি, কারণ এই জষ্ঠি মাসের বেলা সাড়ে-দশটার সময়ে গাঙ্গুলীদের তিন তলা ভদ্রাসনের ছাদের টঙের উপরে অবস্থিত ঠাকুরঘরের দাওয়ায় নারায়ণের ভোগের লুচি হওয়ার জন্য তৈরি হতে থাকা ঘি-ময়দার তালের উপরে চকচকে দৃষ্টি দিতে আর একটা কাক-পক্ষীও নেই !

তাপসী মাসিমার অবশ্য দোষ নেই; আসলে রাণীর স্বভাবই ওই। কোন ভোরে উঠে আগান-বাগানে ঘুরে বেড়ানো দিয়ে তার দিন শুরু হয়, সেই বাসী কাপড়েই। উদ্দেশ্য কি ? না, গাছের ফল কুড়ানো। কোন ফল ? সে কোনো বাছ-বিচার নেই, কাঁচা-পাকা-আধ পচা-পোকায় ধরা যাই হোক না কেন, ফল হলেই হল। কতক্ষণ চলবে ? না, যতক্ষণ না মেজগিন্নী-সেজগিন্নী গাত্রোত্থান করে, স্নান সেরে, ঠাকুঘরে জাগরণ দিয়ে, সকালের পুজোর জোগাড় করে রান্নাঘরে এসে উঠে "রাণী ঠাকুরঝিইইইইই" বলে হাঁক পাড়বেন, তার পনেরো-কুড়ি মিনিট থেকে আধ ঘন্টা পর অবধি। তার পরে বেলা সাড়ে-নটা অবধি সকলের জলখাবার, ছেলে-পুলেদের ইস্কুল-কলেজের টিফিন, কর্তাদের অফিসের ভাতের পাট, সব চুকলে তারপরে গিয়ে রাণীর সাময়িক ছুটি। তখন তার ছোঁকছোঁকানি শুরু হয়- সেজদা কি আজ তবে ভাতের সাথে গোটা মাছটা খেয়েছে ? মেজদার ছেলে বিনু কি তবে চায়ের সাথে দেওয়া গোটা ডিম-টোস্টের পুরোটাই রেখে দিলো ? ভাইঝি রুনু আর টুনুর ঘরে পড়ার টেবিলে কি গতকালের ইস্কুল-ফেরতা কেনা হজমি গুলি বা আচারের খানিকটা রয়ে গেলো ? এই চলবে দুপুর একটা অবধি। তার পরে খেতে বসা বউদি আর ঝি চাকরদের সাথে। ভাতই নেয় কত, সে যেন বিড়ালে ডিঙোতে পারে না এমন করে বাড়ে পাতের উপর ! থালা চাটবে কী, যেন শেষ কণাটি অবধি শুষে না নিয়ে শান্তি নেই ! মাছ-তরকারিতে অবশ্য রাণী তত টান দেয় না, গিন্নিদের ভয়ে। তার পরে দুপুর আড়াইটা থেকে সাড়ে চারটে অবধি বাড়িটা দিবানিদ্রার মধ্যে নিঝুম-নিঃসাড়। তখন রাণীর অখণ্ড স্বাধীনতা। চুপিসারে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যায় সে, পাড়ায় কোথায় সাহাদের বাড়ি হরিনাম সংকির্তন, কোথায় ঘটি-চৌধুরীদের বাড়ি পৌষকালীর ভাসানের পর প্রসাদ বিতরণ, কোথায় মিত্তিরদের বাড়িতে বিপত্তারিণীর ব্রতের পারণ, কোথায় বাঙাল-চৌধুরীদের বাড়ি নবান্নের লক্ষ্মীপুজো, বা যে কোনো মন্দিরে সত্যনারায়ণের শিরনি-সর্বত্র, সর্বত্র সে কেবল ঘুরে ঘুরে বিনা নেমন্তন্নেই খেয়ে বেড়াবে, সেই বিকেল অবধি, যতক্ষণ না ইস্কুল-কলেজ-অফিস-কাছারির ছুটি হয়ে সবাই বাড়ি-মুখো হবে, ততক্ষণ। তার পরে সে গুটি গুটি পায়ে বাড়ি ঢুকবে, হয়তো বা দাদাদের ধমকানি, বউদিদের কিঞ্চিৎ মুখনাড়া শুনে আবার পরের দিন একই কাজ আবার করার জন্য ঘাপটি মেরে বসে থাকবে আর ততক্ষণ সদগতি চলবে সকালে কুড়িয়ে আনা সেই ফলগুলোর !

ফলতঃ প্রায়ই পেটের গণ্ডগোল, বাড়ির লোকে বকে-বুঝিয়ে হয়রান, পাড়ার লোকে চক্ষুলজ্জায় কিছু বলতেও পারে না, আহা, হাজার হোক, ভদ্দলোকের মেয়ে, তায় জন্ম অভাগী, একটু না হয় খায়ই, আর কোনো বদ মতলব তো নেই, যাক গিয়ে, ও নিয়ে আর কোঁদল করে কীই বা হবে ? সেই যে দেশে থাকতে বাপ-মা মরেছেন, সেই থেকে দুই ভাই বোন কাকা-কাকিমার সংসারে মানুষ। নিজের দাদা তো সেই করেই বিয়ে করে সাটকেছে, খুড়তুতো দাদারা রাণীরও বিয়ে ঠিক করেছিলো, কিন্তু বিয়ের আগেই হঠাৎ করে চোখে ছানি পড়ায় সেই বিয়ে ভেঙে যায়। সেই থেকে খুড়তুতো দাদাদের সংসারে দাসীবৃত্তি করেই তো বেচারার চলছে ! তা ছাড়া এতটুকু বিষয়-বিষ না থাকলে আর জাত আর গায়ের রঙ-রূপের দেমাকে মটমট গাঙ্গুলী-গিন্নীদের ঠারে-ঠোরে পাড়ার মেয়ে-মজলিশে কথা শোনানোই বা চলবে কি করে ? যত ফিচকে ছেলেপুলেরা তো মাসান্তে একবার পাড়ার একমাত্র পাস করা ডাক্তার দুর্গাদাস মিত্তিরকে গাঙ্গুলী বাড়ির খিড়কি দরজা ঠেলে ঢুকতে দেখে সামনেই হেসে বলাবলি করে, "রাণী পিসির আবার..."! বয়স্ক বৌ-ঝিরাও সেই সুযোগে মুখ টিপে খানিক হেসে নেয়।

ব্যতিক্রম একমাত্র তাপসী মাসিমা। তিনিও অভাগী, তবে কি না মহিমান্বিত অভাগী, মানে বামুনের ঘরের বিধবা, যার জন্য রাজা রামমোহন রায় থেকে শুরু করে হালের আশাপূর্ণা দেবী অবধি কারও মনে সহানুভূতির কমতি ছিল না, তায় আবার তাপসী মাসিমা থাকেন বেশ ডাঁটের সাথে। অসহায় বলে চেয়ে-চিন্তে দিনাতিপাত করার মানুষ তিনি কোনোকালেই ছিলেন না। কর্তা কলকাতার এক ছোট আপিসে কেরানির চাকরি করতেন। কোনোদিনই হিসাবী ছিলেন না, তার উপরে ছেলে-পুলে না হওয়ায় অত আঁটসাঁট করে বেঁধে সংসারও করা হয়নি কখনো। তাই তিনি হঠাৎ করে গতাসু হতেই যত আপনজনের দল যখন স্বচ্ছন্দে এঁটো ভাঁড় ফেলে মুখ মুছে ফেলার মত সবাই একযোগে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো, তখন তাপসী মাসিমা হাল ধরলেন নিজের হাতে। সেই থেকে তাঁর পেট চলে নিজের হাতে সুতো কেটে পৈতে বানিয়ে, পুরোনো খবরের কাগজ গঁদের আঠায় মুড়ে ঠোঙা বানিয়ে আর পাড়ার যত বাড়িতে পুজো-পার্বণের জোগাড়ের কাজ করে। কীর্তনের হরির লুঠ তৈরি রাখা, শ্রাদ্ধের হবিষ্যি আর পিণ্ড রাঁধা, বিয়েবাড়িতে স্ত্রী-আচার বাদে সমস্ত ফাইফরমায়েশ খাটা, বিপত্তারিণী-মঙ্গলচণ্ডীর লালসুতো-দূর্বাঘাসের ডোর, রাধাকৃষ্ণ-দুর্গা-কালী-লক্ষ্মী-জগদ্ধাত্রী-সরস্বতীর ভোগ রাঁধা-এই সব কাজে আর এ পাড়ার কোনও বাড়িতেই তাপসী মাসিমা ছাড়া অন্য কেউ হাত লাগায় না। চল্লিশের দশকের কথা। ধীরে ধীরে যৌথ পরিবার ভাঙছে, জীবন গতিময় হচ্ছে। গৃহিণীরাও চান, উৎসব-লোকসমাগমের দিনে একটু হাত পা ছড়াতে। তায় আবার পাড়ায় শুদ্ধাচারিণী বলে তাপসী মাসিমার চিরকালই সুনাম আছে- এই সাড়ে-বত্রিশ ভাজার যুগেও এক সন্ধ্যা আলোচালের সেদ্ধভাত, কদমছাঁট চুল, একাদশী, অম্বুবাচী সবই বজায় রেখেছেন, অতএব এই সব কাজের জন্য আর বাড়ির লোকে মাথা ঘামাতে যাবে কেন ? তা ছাড়া গরীব মানুষের এই করে যদি পেট চলে, তো চলুক না !

সংযমের মহিমাই যার আয়ুধ, সহানুভূতিই যার উপজীব্য, সে কীভাবে সেই সহানুভূতির অন্য একজন অসংযমী দাবীদারকে তার এক্তিয়ারের এলাকায় সহ্য করতে পারে ? পারে না। তাই তাপসী মাসিমাও রাণী পিসিকে সহ্য করতে পারেন না।

রাণী পিসি অবশ্য মনে মনে জানেও সে কথা। না হলে তাপসী মাসিমার ভাড়া ঘরের বাড়িওয়ালার উঠোনে যে পারিপারিক শীতলা মন্দিরে প্রতি পূর্ণিমায় ঘটা করে সত্যনারায়ণের সিন্নি আর বছরে একবার বিরাট যজ্ঞ করে শীতলাপুজো হয়, এবং যেখানে তাপসী মাসিমা মন্দিরের নিত্য সেবার জোগাড়-যন্ত্র করে দেন নামমাত্র ভাড়ায় মাথা গোঁজা আর টাইমের কলে চান করতে পারার বিনিময়ে- সেখানে বচ্ছরকার দিন আর মাসান্তে একবার এপাড়া-ওপাড়া-বেপাড়ার সব লোক খেয়ে গেলেও রাণী পিসিকে দেখা যায় না কেন ? আর, জানে বলেই এই মাত্র তাপসী মাসিমার রোষকষায়িত নেত্রযুগল দেখে ঢোঁক গিলে রাণী গুটি গুটি পায়ে নিচে নেমে গেলো !

নারায়ণের সেবার লুচি, তাতেও কি না নজর দেওয়া ! ঘেন্না, ঘেন্না, মা গো ! বয়স তো নয় নয় করে বাইশ-তেইশ বছর হয়ে গেলো, এখনও এমন লুভিষ্টে দশা যেন কচি খুকী ! সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে তাপসী মাসিমা হাত চালিয়ে লুচিক'টা ভেজে পাশে রাখা কাঁসার বড় রেকাবিতে তুলতে লাগলেন। বেশি সময় হাতে নেই। আজ বিনুকে তার বড়জ্যাঠা, মানে বড় গাঙ্গুলী নারায়ণ পুজো করা শেখাবেন। এতকাল কীসের যেন ফাঁড়া ছিল, তাই এত বড় বয়স অবধি পৈতে দেওয়া হয়নি বিনুর। সে সব এখন মিটেছে, তাই এই সামনের সপ্তাহে তার পৈতের দিনক্ষণ নির্ধারণ করা হয়েছে। তাপসী মাসিমাও সেই সুযোগে এই প্রথমবারের মতো গাঙ্গুলীবাড়ির কোনো যজ্ঞিতে জোগাড় দিতে এসেছেন। তবে টাকার বিনিময়ে নয়- বিনু চিরকালই তাপসী মাসিমার বড় ন্যাওটা। সেই ছোট্টবেলার থেকে, যখন বিনু-টুনু-মন্টু-ঝুনু চার ভাইবোনে মিলে তাপসী মাসিমার ভাড়া-ঘরের উঠোনের জামরুল আর পেয়ারা গাছদুটোর থেকে ফল পাড়তে আসতো, তখন থেকে। বিশেষ করে বিনু যেন চিরকালই তাপসী মাসিমার দিকে একটু বেশি টানে। পাড়ার ঠানদিদি-গোছের কত মেয়েরা কত বার বলাবলি করেছেন, "আর জন্মের ছেলে এ জন্মে আবার ফিরে পেয়েছে পোড়াকপালী তাপসী!" কতবার মেজগিন্নী বা সেজগিন্নীর অসুখ করলে তাপসী মাসিমা গিয়ে ওদের রেঁধে বেড়ে দিয়েছেন। শুধু কি তাই ? সেবার বিনু যখন সান্নিপাতিক জ্বরে প্রায় যায় যায় অবস্থা, তখন তার মা মেজগিন্নী তো ঠাকুরঘরে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকা আর কালীঘাটে এয়োত বাঁধা দেওয়া নিয়েই পড়েছিলো, মেজ-সেজ দুই গাঙ্গুলী মিলে কলকাতা থেকে বড় ডাক্তার ডাকা, ওষুধ-পথ্যি কেনা আর তার সাথে আপিস-কাছারি নিয়ে হিমসিম খাচ্ছিলো আর সেজগিন্নী একা হাতে পুরো সংসার সামাল দিতে নাজেহাল হচ্ছিলো (বড় তরফের সংসার চিরকালই আলাদা; বড় গাঙ্গুলী চাকরি নিয়ে তাঁর গিন্নী আর তিন ছেলে মেয়ে নিয়ে থাকে পশ্চিমের খোট্টাদের দেশের কোন যেন শহরে)- তখন দিন রাত এক করে কে বিনুর কাছে পড়ে থাকতো, শুনি ? সে তো এই তাপসী মাসিমাই! চাকর-বাকরও তখন রোগের ভয়ে কাছে ঘেঁষ নিতো না ! আর তার পর যখন রোগা সুতোটি প্রায় হয়ে সে বিছানা থেকে উঠলো, ডাক্তার ভালো করে মাছ-মাংস খেতে বলে দিলো, আর সেই তখনই গাঙ্গুলী বাড়ির কোন এক জ্ঞাতি মারা যাওয়ায় অশৌচ পড়ল, তখন কে লুকিয়ে বিনুকে আলাদা করে সিঙি মাছের ঝোলের সাথে গলা ভাত কে রেঁধে খাওয়াতো রোজ, নাকে-মুখে গামছা বেঁধে ? সেই শীতের রাতে মাছের ছোঁয়া যাওয়ার আবার কে সেনবাড়ির বড় দিঘিতে নেয়ে আসতো ? তাপসী মাসিমা ছাড়া আর কে ?

কাল সেই বিনুর পৈতে ! তাপসী মাসিমা সব যজ্ঞিবাড়িতে গিয়ে জোগাড়-যন্ত্র করে দেন, আর আজ দেবেন না ? তার জন্য আবার পয়সা ! রাম কহ ! মেজগিন্নী যখন সেই দিন দুপুরে পাড়ার মেয়ে

মজলিসে বসে বললেন, "তা চক্কোত্তি দিদি, আপনাকে আর আলাদা করে বলবো কী, বংশের বড় ছেলের পৈতে, তায় অ্যাদ্দিন বাদে একটা কাজ পড়েছে, সাত দিন আগের থেকেই এসো জন-বসো জন শুরু হয়ে যাবে, আপনি না গিয়ে দাঁড়ালে তো আমরা দুই বউয়ে মিলে একা হাতে পারবো না ! আপনি চিন্তা করবেন না, পেন্নামীর দরুণ আপনার জন্য...." তাড়াতাড়ি তাকে থামিয়ে দিয়ে তাপসী মাসিমা বলেছিলেন "ও কি কথা মেজোগিন্নী ! বিনুর পৈতে, তাতে গতরে খেটে টাকা নিতে যাবো আমি ? বিনু আমার বেঁচে থাক, টাকার কথা তুমি বলো না, এই মাথার দিব্যি দিলুম আমি !" মেজগিন্নী আর কিছু বলেননি, "তবে আর কী, কাল থেকেই কাজে লেগে পড়ুন" বলে চুপ করে গিয়েছিলেন।

আসলে, লুচির গাওয়া ঘি ফুটতে ফুটতে কড়াইয়ে যেমন বুদবুদ কাটছে, সেই উত্তপ্ত ঘিয়ের বুদবুদের মতই জষ্ঠি মাসের রোদ্দুরে উত্তপ্ত তাপসী মাসিমার মনেও একটি ইচ্ছা বুড়বুড়ি কাটছে। আচ্ছা, তিনি বিনুর ভিক্ষে মা হতে পারেন না ? নিজের সন্তান তো নেই, কোনোকালেই মা-ডাক শোনা হল না, হবেও না, ভগবান সেই ব্যবস্থা পাকা করে তবে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। বিনুকে তিনি সন্তান জ্ঞানে ভালোবাসেন। না হয় ভিক্ষা-মাই হলেন !

মেজগিন্নী কি এতই অবুছ হবেন ? নিশ্চয়ই বিনুর প্রতি তাপসী মাসিমার টান তাঁর চোখ এড়ায়নি। আর, হবেই বা কে ভিক্ষা মা ? মেজগিন্নীর বাপের বাড়ির আত্মীয়-কুটুম্বের যাওয়া আসা তেমন নেই। বড়গিন্নী চিরকালই আলাদা সংসারে একলা একেশ্বরী, এ সংসারের সাথে কেমন আলগা আলগা, ছাড়া ছাড়া ভাব। মেজগিন্নী-সেজগিন্নী একই সংসারে থাকলেও, ভিতরে ভিতরে দুইজনের ভারী রেশারেশি, তা পাড়ার মেয়েরা সকলেই জানে। আর বাকি রইল রাণী। ছ্যাঃ ! আচার বিচার মানে না, অলুক্ষুণে দ'পড়া না সধবা-না কুমারী-না বিধবা, তাকে আবার শুভ কাজে যেচে ডালা-কুলো ধরানো কীসের জন্য ? তাপসী মাসিমা ছাড়া আর আছেই বা কে ? কে ?

মেজগিন্নীর কাছে কথাটা পেড়ে দেখবেন না কি ? ছোট থেকেই বিনুর এত টান তার উপর, নিশ্চয়ই আপত্তি করবে না ! না না ছি ছি, তা কি করে হয় ! নিজে থেকে বলা যায় না কি ? তাঁরা কী ভাববেন !

প্রয়াত স্বামীর বিয়ের যৌতুক হিসেবে পাওয়া যে সোনার হারটা আছে সেটা তিনি সেইদিনই বিনুর নাম করে রেখে দিয়েছেন। সেটা একবার মেজগিন্নীকে দেখাবেন না কি তাপসী মাসিমা ? তাতে আভাস দেওয়াও হবে, আবার সরাসরি না বলেই কাজ সারা হবে !

চিন্তায় ছেদ পড়ল সিঁড়ির কাছ থেকে সেজগিন্নীর কর্কশ গলার ডাকে, "বলি ও চক্কোত্তি-দি, তোমার হলো ? বড়ঠাকুর নেয়ে ফিরলেন এই মাত্র, এখনই বিনুকে নিয়ে পুজোয় বসবেন যে !"

চমক ভেঙে তাপসী মাসিমা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "হ্যাঁ, যাই !"

****

পাট ভাঙা ধুতি আর চাদর পরে বিনু বসেছে তার জ্যাঠামশায়ের এক পাশে, খানিকটা জড়-সড় হয়েউ। পৈতে হওয়ার পর থেকে এই বাড়ির বড় ছেলে হিসেবে তাকেই নিত্য নারায়ণের সেবা করতে হবে,

তেমনটাই নিয়ম। কাল পৈতে, তার পরে গোটা দিন অদর্শনে কাটাতে হবে (সামনে পরীক্ষা তাই তার জন্য তিন দিনের অদর্শন নয়, কুলপুরোহিত বাবাকে বলেছেন যে এক সন্ধ্যা অদর্শনে থেকে মূল্য ধরে দিলেই হবে)। এ সরে তার একটুকুও মনোযোগ বা ইচ্ছা কোনোটাই নেই, এত বড় বয়সে নতুন করে তা হওয়াও সম্ভব নয়, তাও বাড়ির বড়দের আদেশে আজ এখানে বসতে হয়েছে !

ও-ধার থেকে বড়-গাঙ্গুলী বলে চলেছেন, "এর পরে আসনশুদ্ধি করবি, মন্ত্র বলবি, 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ'...."

অন্য দিকে তাপসী মাসিমা বসে বসে বড় ফুলকাটা কাঁসার রেকারিতে ধূমায়িত গাওয়া ঘিতে সদ্য ভাজা লুচি, পাঁচ রকম তরকারি ভাজা আর সুজির মোহনভোগ বেড়ে রাখছেন ও ফাঁকে ফাঁকে বাঁ হাতে মাথার ঘোমটা তুলে পাড়া-সম্পর্কীয় ভাসুর বড়-গাঙ্গুলীর সামনে শিষ্টাচার রক্ষা করছেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাকিয়ে দেখছেন বিনুর মুখের দিকে। বিনুর শৈশব ও কৈশোরের নানা স্মৃতি যেন আজ ঠাকুরঘরের ধূপ-ধুনোর ধোঁয়া হয়ে তার অবয়বটাকে আলতো করে ঘিরে রেখেছে। সেই ছোটবেলায় কেমন ঠাকুরমার ঝুলির গল্প শুনতে শুনতে তাঁর কোলেই ঘুমিয়ে পড়তো বিনু ! তিনি তখন সদ্য বিয়ে হয়ে এই পাড়ায় বসাকদের বাড়িতে ভাড়া থাকতে এসেছেন কর্তার সাথে। রাতে ঘুমিয়ে পড়লে প্রায়শই বিনু আর বাড়ি যেতে চাইতো না। তাপসী মাসিমাও জোর করতেন না, একা হাতে ঘরের সব কাজ করা, কর্তার মৃদু আপত্তি, সব উপেক্ষা করে বিনুকে বিছানার এক পাশে রেখে তিনি ঘুমোতেন। কেমন সুন্দর ঝুলন সাজাতো ওরা চার ভাইবোনে মিলে ! রথের দিন শ্রীদামে ছুতোরের কাছে বায়না দিয়ে বানানো কাঠের ছোট্ট রথটা টানতে টানতে পাড়ার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময়ে বিনু সবার প্রথমে তাপসী মাসিমার বাড়িতে থামবেই। দোলের দিন বুক-পকেটে আবিরের ঠোঙা নিয়ে বিনু আসবে সকাল না হতেই, তাই সারা সংসারের কাজ সেরে রাতে বসে মালপোয়া ভাজতেন তিনি। বিজয়া দশমীতে গাঙ্গুলী বাড়ির ঠাকুরের ভাসান হতে না হতেই সে ছুটে আসতো, তাই আনন্দনাড়ু, ক্ষীরের গজা আর নিমকি তৈরি রাখতেন তিনি, সেই ষষ্ঠীর দিন থেকে খেটে-খুটে।

নিজের অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তাপসী মাসিমা। বিনু আজ কয়েক বছর ধরে শহরের বড় সাহেবী কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পড়ছে। সেখানেই বাসাবাড়িতে তাকে রেখেছেন তার বাবা। রথ-রাস-ঝুলনের পাট তো সে বড় হতে হতে প্রায় উঠেই গিয়েছিল, এখন বিনুর সাথে তাঁর বচ্ছরকার দোল আর দশমীর দিনের দেখাটাও হয় খুব কম সময়ের জন্য। অবশ্য ছুটি পেলেই সে বাড়ি এসে আগে দেখা করে যায় তাঁর সাথে !

ও পাশ থেকে বড় গাঙ্গুলী বলছেন, "তুলসী চয়নের জন্য আলাদা মন্ত্র, তুলসী দেবীকে প্রণামের আলাদা মন্ত্র, বল এবার, 'বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ....'আহ মন দিয়ে শেখ না বিনু ! কী হচ্ছে ?"

বিনু লজ্জা পেয়ে বলল, "যে আজ্ঞে জ্যাঠামশাই, শুনছি।"

ঘন্টাখানেক লাগলো পুজো শেষ হতে। ততক্ষণে ঠাকুঘরের বাইরে বড়-মেজ-সেজ তিন গাঙ্গুলী গিন্নী,

বাকি দুই গাঙ্গুলী কর্তা, মন্টু, টুনু, ঝুনু বড়গিন্নীর দুই মেয়ে ললি-মলি ও এক ছেলে রিন্টু, এবং অতি অবশ্যই রাণী এসে দাঁড়িয়েছে, প্রসাদ পাওয়ার জন্য। জলশঙ্খ থেকে জল ঢেলে, শালগ্রাম শিলাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে ও বিনুকে প্রণাম করিয়ে বড়-গাঙ্গুলী উঠে দাঁড়ালেন। তাপসী মাসিমাও ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে হাতে কলাপাতা তুলে নিলেন, সকলকে প্রসাদ বিতরণ করতে হবে।
বিনু আর মন্টু কর্তাদের সাথে খেতে বসল। তিন গিন্নী মিলে পরিবেশন তদারক করতে লাগলেন। অন্য দিকে এক পাশে বসল ললি, মলি, টুনু আর ঝুনু, দুটো কলাপাতা টেনে নিয়ে। রাণী চোরের মত এক পাশে দাঁড়িয়ে রইল, যেন এই অন্তরঙ্গ পারিবারিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে তার স্থান কোথায় তা সে ঠিক খুঁজে পাচ্ছে না।

তাপসী মাসিমা প্রথমেই বিনুর পাতে চারটে লুচি আর বেশ খানিকটা মোহনভোগ বেড়ে দিয়ে বললেন, "খা বাবা। সকাল থেকে উপোস করে আছিস, অভ্যাস তো নেই, নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে খুব !" বিনু অল্প হেসে মুখে বলল, "হ্যাঁ, খাচ্ছি তো মাসিমা।" বলে পাতের লুচি কয়টা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো।

সবার খাওয়া চলতে লাগল। এর মধ্যেই কিছুক্ষণ বাদে টুনু-ঝুনু নিচে নেমে গেল, তারা না কি আজ বড়গিন্নীর দুই মেয়ের সাথে টকি ছবি দেখতে যাবে। রিন্টু আর মন্টু দুই ভাইও উঠি-উঠি করছে, কিন্তু বিনু এতই আস্তে খাচ্ছে যে তাদেরও বসে থাকতে হচ্ছে। কর্তারা কাজে বেরোবেন, তাই আগে-ভাগেই নেমে গিয়েছেন। মেজগিন্নী-বড়গিন্নীও কলাপাতায় বউদের প্রসাদটুকু নিয়ে হেঁশেলের দিকে নেমে গেলেন। এমনমন সময়ে সেজগিন্নী ঠাকুরঘরের ভিতর থেকে হাঁক পাড়লেন, "বলি ও চক্কোত্তি-দি, একবারটি ইদিকে এসো দিকিনি। কালকের বামুন-বিদায়ের জন্য ক'টা পৈতে রেখেছো ?"

তাপসী মাসিমাকে উঠতে হল, কারণ ব্রাহ্মণ-বিদায়ের জন্য নিজের ব্যবসার পুঁজির থেকেই তিনি স্বহস্ত-নির্মিত যজ্ঞসূত্রগুলি নিয়ে এসেছেন। "ওই তো বারোটা আছে, আরও লাগলে সুতো কেটে আজ রাতেই বানিয়ে নেবো'খন" বলতে বলতে তিনি উঠে ঠাকুরঘরের মধ্যে চলে গেলেন। সেই সুযোগে বিনু পাতে আধখানা লুচি আর বেশ খানিকটা মোহনভোগ রেখেই উঠে পড়ল ও "শরীর খারাপ লাগছে" বলে দ্রুত পদে সিঁড়ি বেয়ে একতলায় নেমে গেলো, এবং একবার সকলে চোখের আড়াল হতেই ওই আধখানা লুচির উপর রাণী হামলে পড়ল। খাওয়ায় সে এতই ব্যস্ত যে টেরও পেলো না কখন গিন্নীরা আর তাপসী মাসিমা এক সাথে তার পিছনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছেন, এবং বড়গিন্নী "ও মা গো এ কী কাণ্ড!" না বলা অবধি তার সম্বিৎ ফিরলও না !

তাপসী মাসিমার আর সহ্য হল না। চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে লাগলেন, "তা হ্যাঁ গা, বলি সাত কাল গিয়ে তো এক কালে ঠেকেছে, তা কালকে বাছার পৈতে, এত ফাঁড়া গেছে, আর আজকের দিনে গুরুজন হয়ে তার পাতের এঁটো খেয়ে ছেলেমানুষের পাপ না বাড়ালেই চলছিল না ? বলি সকাল থেকেই তো গাছের ফল গিলে বসে থাকো, তা এ বাড়িতে কি কেউ তোমাকে খেতে দেয় না যে সর্বদা খাওয়া নিয়ে এমন ছোটোলোকি কারবার করে বেড়াও ? বলি ঘেন্নাও ধরে না নিজের উপর ? সাক্ষাৎ নারায়ণের পেসাদ, বলতে নেই, তাও না বলে পারছি না, বলি এখনই তো পিণ্ডি গিলবে খানিক, এতটুকুও তর সইছিল না

? বলিহারি যাই বাপু !"

বড়গিন্নী হতভম্ব। মেজগিন্নী-সেজগিন্নীর মুখ রক্তবর্ণ-সেটা যতটা না রাগে, তার চেয়ে অনেক বেশি বিদেশ থেকে বাড়াতে আসা বড়জায়ের সামনে অপমানিত হওয়ার কারণে। বিশেষ করে মেজগিন্নীর সহবত-জ্ঞান বড় টনটনে, বাপের বাড়ি কলকাতায়, লেখাপড়া জানে, আপনি-আজ্ঞে করে কথা বলে। তাই সেই বলল কোনোক্রমে জোরে চেঁচিয়ে, "দূর হও দেখি আমার চোখের সামনে থেকে রাণী ঠাকুরঝি, বলি লোক হাসানোর আর জায়গা আর সময় পেলে না ? আশ্চর্য বাবা যা হোক !"

রাণী কাষ্ঠ হাসি হেসে আমতা আমতা করে বলতে লাগল, "বামুনের এঁটোয় দোষ কি বৌদি ? বিনু তো... মানে এই পেসাদ ফেলা যাবে তাই..."

মেঝেতে পা ঠুকে এবার গর্জে উঠলেন সেজগিন্নী, "আহা, তুমি বড় আচার-বিচার মেনে চল কি না, তাই পেসাদ ফেলা যাওয়ার তোমার গায়ে ফোস্কা পড়ছে ! ঢঙ যত্তসব, ন্যাকামি দেখে আর বাঁচিনে, বাবা বাবা কী ঘেন্না !"

রাণী মুখ চুন করে সরে গেল। তাকে সরে যেতে হল।

অবশিষ্ট প্রসাদ-সহ কলাপাতাটা এক টানে মুড়িয়ে নিয়ে মেজগিন্নী রাগে গরগর করতে করতে অন্যত্র চলে গেল।

****

পরদিন ভোরবেলা। বিনু ক্ষৌরকর্ম সেরে হোমকুণ্ডের এক পাশে বসেছে, পাশে তার বাবা, গাঙ্গুলীবাড়ির মেজকর্তা; তিনিই আচার্য হয়েছেন। পৌরহিত্য করছেন কুলপুরোহিত নিত্যশরণ ভট্টাচার্য মশাই। হোমের আগুনের তাপে বিনুর সদ্যমুণ্ডিত মস্তক-সহ মুখমণ্ডল চকচক করছে।

তাপসী মাসিমা অবশ্য এই সব থেকে অনেক দূরে। সকাল থেকেই 'এসো-জন-বসো-জন' লেগে আছে যজ্ঞিবাড়িতে। আজ তো তবু শুধু আত্মীয়রা খাবে; পাড়া-প্রতিবেশী আর বন্ধুবান্ধবদের ভোজ হবে কাল। তাদের চা করে দেওয়া, জলখাবার দেওয়া, দফায় দফায় নানা খুচরো কাজ করার মধ্যেই তিনি মেতে আছেন। কান পেতে মাঝে মাঝে শুনছেন, ভিক্ষা দেওয়া শুরু হল কি না। নিত্য ভটচাজের গলায় মন্ত্র ভেসে আসছে, "ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং বৃহস্পতের্যৎ সহজং..."

রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে তাপসী মাসিমা নানা সাত-পাঁচ ভাবছিলেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে মেজগিন্নীকে ভিক্ষা মা কে হবে তা জানার চেষ্টা করেছিলেন, তবে সুবিধা হয়নি। বিনুর না কি তিন দিনের বদলে এক বেলা অদর্শন ! কী জানি বাবা, কালে কালে কী সব হচ্ছে ! তাঁদের সময়কালে তো এমন অনাচ্চিষ্টির কথা ভাবাই যেতো না। যাক গিয়ে যাক, ভটচাজ যখন বলেছেন যে মূল্য ধরে দিলেই হবে, তখন কোনো

বিধান আছে নিশ্চয়ই।

এখনও ভিক্ষে-মা হওয়ার কথা বলল না তো কেউ ? তবে কি অন্য কাউকে স্থির করেছেন তাঁরা ? হবেও বা ! তাপসী মাসিমার উঠোনের যে পেয়ারা গাছটার পেয়ারা বিনু খেতে সবচেয়ে ভালোবাসতো, সেটার বেশ বড় বড় কয়েকটা ফল তিনি লুকিয়ে ঝোলার মধ্যে নিয়ে এসেছেন, আজ ভোর বেলা স্নান করার পরেই, সাথে কর্তার সেই হারটা। তিনি স্থির করলেন যে পৈতে ধারণের পর যখন সবাই ভিক্ষা দেবেন, তখনই তিনিও ওগুলো বিনুকে দিয়ে দেবেন। পরে যদি আর সুযোগ না পাওয়া যায় ?

দম ফেলার ফুরসত নেই। দফায় দফায় চা করা, তরকারির জন্য সবজি কাটা, মসলা বাটা করতে করতেই সন্ত্রস্ত কান সজাগ হয়ে আছে, ভিক্ষা দেওয়া শুরু হল না কি ? আজ তাপসী মাসিমার যেন রাণীর প্রতি অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করার সময়ও নেই। বিনুর মুখ থেকে একবার 'মা' ডাক শুনতে পাওয়ার জন্য তিনি যে কতটা উদগ্রীব হয়ে আছেন, তা তিনিই জানেন !

ঢং ঢং করে বড় বৈঠকখানা ঘরের ঘড়িতে বারোটা বাজল, এবং তখনই তাপসী মাসিমা শুনতে পেলেন, বাইরে মেজ গাঙ্গুলী বলছেন, "এবার আগে মাকে প্রণাম করো, করে বলো, 'ভবতি ভিক্ষাং দেহি মাতঃ'..."

তার মানে ভিক্ষা দেওয়া শুরু হয়েছে ! তড়িঘড়ি ডালের কড়াইয়ে এক ঘটি জল ঢেলে তাপসী মাসিমা কোণের থেকে টেনে নিলেন তাঁর সেই পেয়ারা ও সোনার হার ভর্তি ঝোলা। পড়ি কি মরি করে দাঁড়িয়ে পিছনে ঘুরে তিনি ছুটলেন বড় উঠোনের দিকে। রান্নাঘরের দাওয়া থেকে যে সরু বারান্দাটা দিয়ে সেখানে যাওয়া যায়, তার প্রান্তে এসে তিনি উঁকি দিলেন।

আহা, বিনুকে কি মিষ্টিই না লাগছে ! হাতে বেলের লাঠি, পরনে গেরুয়া কাপড় আর ন্যাড়া মাথায় যেন নদের চাঁদ নিমাইঠাকুরটি ! মাথায় ঘোমটা আরও ঘন করে টেনে নিয়ে তিনি সন্তর্পণে পা বাড়াতে যাবেন, হঠাৎ সেজগিন্নীর গলার স্বরে চমকে উঠলেন।

"বলি ও চক্কোত্তি-দি, এখন এখানে কী করছো ? পায়েসটা চড়িয়ে দাও না, কয়েক ঘন্টা পরেই তো আবার ভিক্ষা-মাকে ভিক্ষা দিতে হবে !"

ততক্ষণে মেজগিন্নীর ছেলেকে ভিক্ষা দেওয়া হয়ে গিয়েছে, তিনিও বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেশি সময় তো নেই, আপনি এখনই চড়িয়ে দিন পায়েসটা। বাছা সারাটা দিন উপোসে আছে, আজকের দিন মিটলে বাঁচা যায় ! একটু পড়েই তো আবার ভিক্ষা দেওয়া। আপনি না করলে আর কে করবে ?"

ভিক্ষা-মায়ের হাতের পায়েস চড়াতে বলা হচ্ছে তাঁকে ! তাপসী মাসিমা যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না কথাটা। তার মানে কি ঠাকুর শেষ অবধি তার কথা শুনলেন ? তাঁর অজান্তেই তাঁকে ভিক্ষে-মা করতে স্থির করেছেন মেজগিন্নী ! তাঁর এত দিনের নানা যজ্ঞিবাড়িতে ঠাকুরপুজোর ভোগ রাঁধা, জোগান দেওয়া,

সব কি তবে কিছুটা হলেও ফলবতী হল ?

তাপসী মাসিমা "হ্যাঁ, এই যাই" বলে পিছন ফিরলেন।

****

বাড়ি যাচ্ছেন তাপসী মাসিমা। পা যেন তার আর চলতে চাইছে না। কপালের এক পাশ কেটে গিয়ে ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে।

সন্ধ্যায় বিনু যখন বন্ধ ঘরের থেকে বেরোলো, তখন বাটিতে নলেন গুড়ের পায়েস আর ঝোলাতে সেই পেয়ারা আর সোনার হার নিয়ে প্রস্তুত হয়েই ছিলেন তাপসী মাসিমা। ঝকঝকে নতুন কাঁসার বাটি-চামচে তা বসিয়ে, অন্য হাতে সেই ঝোলাটা শক্ত করে ধরে তিনি দোতলার দরজা বন্ধ ঘরটার দিকে এগোতে যাবেন, এমন সময়ে পাশের বাড়ির বাঁড়ুজ্যে গিন্নীকে সাথে নিয়ে উদয় হলেন মেজগিন্নী আর সেজগিন্নী। তিনজনে গলায় গলায় সই। তাপসী মাসিমা কিছু বুঝে ওঠার আগেই মেজগিন্নী বললেন, "ওঃ এই তো পায়েস হয়ে গিয়েছে। নাও গো সুধা ! তুমিই তো ভিক্ষা-মা হবে ! তুমিই হাতে নাও, আমরা আর ওতে হাত লাগাবো না !"

'ভিক্ষা মা হবে' মানে ? তাপসী মাসিমার মাথা ঝমঝম করে উঠল। সবই তবে ফাঁকি ? বাঁড়ুজ্যে গিন্নীর পিছন পিছন টলতে টলতে সেই ঝোলাটা সাথে করে তাপসী মাসিমা যখন দোতলায় বিনুর ঘরের দিকে পা বাড়ালেন, তখন তাঁর চোখেও আর জল আসতে চাইছে না। সত্যিই, কী ভেবেছিলেন তিনি ? পাড়ার সেরা বড়লোক গাঙ্গুলীরা কেন তাঁকে ভিক্ষে-মা করতে যাবে ? আত্মীয়তা-বন্ধুত্ব এগুলো হয় সেয়ানে-সেয়ানে, সমানে-সমানে। তাঁর মত পোড় খাওয়া মানুষের কী করে এত বড় ভুল হল ? কেন তিনি আশা করলেন ? নিজের মানসিক দৈন্যদশা প্রকট হয়ে পড়ায় তাঁর এখন নিজেরই নিজেকে চড় কষাতে ইচ্ছা করছে।

বিনু ঘর থেকে বেরিয়েছে। বাঁড়ুজ্যে গিন্নী হাসি হাসি মুখে তাকে পায়েস খাইয়ে দিচ্ছেন।

সবার পিছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসব ভাবতে তাপসঅ মাসিমার মাথা উত্তপ্ত হয়ে উঠল, হঠাৎ করে তিনি টাল সামলাতে না পেরে মাথা ঘুরে পড়লেন সামনে দাঁড়ানো এক নিমন্ত্রিতা মহিলার গায়ের উপর। তিনি পড়ে গিয়ে "ও মা গো কী হল গো" বলে আর্তনাদ করে হাত পা ছুঁড়তে লাগলেন, এবং তাপসী মাসিমার মাথা ঠুকে গেলো শান বাঁধানো মেঝের এক কোণে। কপাল ফেটে ঝরঝর করে রক্ত ঝরতে ঝরতে পরনের থানের সামনেটায় ফোঁটা ফোঁটা হয়ে ভিজিয়ে দিলো।

ততক্ষণে চারপাশে ভিড় জমে গিয়েছে। কে যেন বলছে, "কে গা ? আগে তো দেখিনি ! সারাদিন পর কাজের বাড়িতে নতুন লোক- এ তো ভালো কথা নয় !"

ষণ্ডামার্কা একটা কে লোক তাঁর সেই ঝোলটা থেকে বেরিয়ে পড়া পেয়ারাগুলোর একটা তুলে বলতে লাগলো, "চোর ! চোর ! মেজবউঠান, সেজবউঠান দেখুন-ভিক্ষের ফলমূল চুরি করতে এসেছে !"

আঁচল থেকে সেই হার ছড়াও বেরিয়ে পড়েছিলো। সেটা খপ করে ধরে ফেলে এক জন অল্পবয়সী মেয়ে বলতে লাগলো, "ও মা গো ! এ যে সোনার হার। কার থেকে সরিয়েছে কে জানে ?"

গিন্নীরা পড়ি-মরি করে দৌড়ে সামনে এসে থ' বনে গেলেন। মেজগিন্নী মুখ শক্ত করে কোনোমতে বললেন, "না না, চোর নয়, বামুনদিদি, আজকের সব কাজ করার জন্য রাখা হয়েছিল।"

'রাখা' হয়েছিলো ? সত্যিই ?

সেই ষণ্ডমার্কা লোকটা মাথা নেড়ে বলল, "বামুনদিদি হোক আর যেই হোক, চোর কি না তা কী করে বলা যাবে ? আগে সবাইকে জিজ্ঞাসা করা হোক কারও হার খোয়া গিয়েছে কি না।"

সেজগিন্নী অবশ্য অত সহজে মুখে কুলুপ আঁটেন না, তিনি গর্জে উঠে বললেন, "চক্কোত্তি-দি, তোমার আক্কেলটা কী ? শুভদিনে রক্তারক্তি করে একটা অনর্থ পাকালে তো ? যাও দূর হয়ে যাও দেখি। তোমার সিধে তোমার বাড়ি পৌঁছে দেব'খন !"

তাপসী মাসিমা অতি কষ্টে বলেন, "না, ওগুলো সব আমার, বিনুকে দেবো বলে এনেছিলাম।"

মেজগিন্নী এবার ঝাঁকিয়ে ওঠেন, "এখন কি এই সব দেওয়ার সময় ? সব কিছুর একটা নিয়ম আছে তো না কি ? এখন তো ভিক্ষে-মা ছাড়া আর কেউ কিছু দেবে না !"

বিনুর দিকে তাকিয়ে দেখলেন তাপসী মাসিমা। সে মাথা নিচু করে আছে।

হার, পেয়ারা, ঝোলা সব ফেলে রেখে তাপসী মাসিমা কোনোমত উঠে দাঁড়ালেন। কোনো কথা না বলে তিনি দ্রুত পায়ে ফটক পার হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে গেলেন।

বেরোনোর সময়ে কানে এলো, মেজগিন্নী সেজগিন্নী আর বড়গিন্নীকে বলছে, "পয়সা দেবো, কাজ করাবো এই অবধি সম্পর্ক। তা সে পয়সা না নিতে চাইলে কী করব ? যেচে কুটুম্বিতা পাতাবো না কি ? "বিনুকে দেওয়ার জন্য এনেছিলাম"- আদিখ্যেতা কত !"

হাতের উপর এক ফোঁটা রক্ত পড়েছে।

তাপসী মাসিমার মনে পড়ে গেলা অনেক দিন আগের কথা। তখনও কর্তা বেঁচে। জীবনের সমস্ত না-পাওয়াকে উল্টে দেওয়ার একমাত্র সম্ভাবনাটি সন্ধ্যাতারার মত উদয় হয়েই আবার মাস তিনেকের মাথায় ঝরে পড়েছিলো, নিঃশব্দে। মঙ্গলা দাইকে ডেকে ভেষজ ওষুধ খেয়ে দাঁতে দাঁত চেপে পড়েছিলেন। এক ফোঁটাও জল পড়েনি চোখ থেকে।

আজ এত দিন পড়ে সেই উদ্বৃত্ত অশ্রু ঝরতে লাগলো তাপসী মাসিমার দুই চোখ বেয়ে।
****

গভীর রাত। গাঙ্গুলীবাড়িতে সকলে ঘুমে আচ্ছন্ন। শুধু বিনুর চোখে ঘুম নেই। একে তো সারা দিনের ধকল, তার উপর বিকেলের ওই বিশ্রী ঝামেলা। তাপসী মাসিমা বেরিয়ে যাওয়ার পরেও কারও হার খোয়া গিয়েছে কি না সেই তল্লাশি চালানো হয়েছে। শেষে কাউকে না পাওয়া গিয়ে রায় দেওয়া হয়েছে যে ও হার তবে মাসিমারই, আগামীকাল সিধের সাথে তাকেই ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

সব মিলিয়ে মনটা খুব বিক্ষিপ্ত লাগছে।

খিদেও পাচ্ছে বেশ। নাহ্। এই সময়ে কোথায় খাবার পাওয়া যায়।

রান্নাঘরে গিয়ে একবার দেখবে না কি ?

পা টিপে টিপে সে ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল। প্রায় দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে, এমন সময়ে কে যেন পিছন থেকে ডাকলো, "বিনু ?"
হঠাৎ ডাক শুনে বুক ধড়ফড় করে উঠল বিনুর। একটু ধাতস্থ হয়ে বলল, "ওঃ রাণী পিসি তুমি !"

রাণী বলল, "হ্যাঁ, রান্নাঘরে বাসন মাজছিলাম। কী চাই তোর ?"

বিনু মাথা চুলকে বলল, "আসলে, খিদে পাচ্ছে !"

রাণী বলল, "দাঁড়া তবে, তোর জন্য একটা জিনিস রেখেছি।" এই বলে উনুনের পিছন থেকে বার করে আনলো সেই পেয়ারা, আর সাথে হার ছড়া।
বিনু মাটির দিকে তাকিয়ে আছে।

রাণী বলে চলে, "তোর ঘরের বাইরে গড়াগড়ি যাচ্ছিল, তাই চুপিচুপি তুলে রেখেছি। বিনু রে, দেশে বাবা মা বেঁচে থাকতে খাবারের কষ্ট যত পেয়েছি, তা আর তত কিছুতে পাইনি। এখানে যখন দেখি খাবার গড়াগড়ি যাচ্ছে, তখন বড্ড কষ্ট হয়, তাই বাড়িয়ে-কুড়িয়ে তুলে রাখি। রাগ করিস না বাবা। তাপসীদি তোকে বড় ভালোবাসেন। কাল একবার তাঁর কাছে গিয়ে দেখা করিস !"

বিনু মাটির দিকেই তাকিয়ে থাকে। তার মনে পড়ে যায় ছোটবেলার সান্নিপাতিক জ্বরের সেই আবছা স্মৃতি। রাণী পিসি তখন সবে দেশ থেকে এসেছে। মাথার কাছে বসে থাকতো তাপসী মাসিমা, আর ঘরের বাইরে দিন নেই রাত নেই- রাণী পিসি একা, মুখ বুজে ফাইফরমায়েশ খাটার জন্য। চাকরে বাকরেও যে তখন রোগের ভয়ে ঘেঁষতো না !

বিনুর চোখ জ্বালা করে ওঠে !

খট্ খট্ খট্ (২)

- অঙ্কিতা দেবনাথ

দরজায় কড়াঘাত পরতেই আচমকা খেয়াল হলো দামিনীর।

দরজা খুলেই দেখেন সতীশ বাবু।
"আরে সতীশ বাবু আইয়ে আইয়ে"
"কেইসি হো বৌদি, ভালো তো ?!"
"হাঁ হাঁ ভালোই"
"দু-দিন দেখতে পাইনি, কোথাও গেলেন নাকি, কহি গয়ে থে"
"হা বো বরবার ছুট্টি থি, ছুটি ছিল, তো দিঘা গেছিলাম"
"মিষ্টার জোশি....."
"বো তো অফিসে, বস্ এসেই চলে গেছেন। চায় নেবেন ??"
"আরে না না। এখন না। তবে দেখুন তো হঠাৎ কতবড় সর্বনাশই না হয়ে গেল"
"কয়া হুয়া, মানে কি হল ??"
(আশ্চয্যের সহিত) "জয়প্রদ বাবুর মেয়ে রবিবার রাতে ছাদ থেকে পরে মারা যায়, সবাই আত্মহত্যাই মরে করেছিল।
কিন্তু....."
"কিন্তু, কি ??" (ভয়ে আশ্চর্যে)
"ওর ডায়েরিতে পাওয়া যায় বিভৎস একটি গন্ধযুক্ত পত্র....এক চিঠি.....বহুত্ গন্দা গন্ধ মানে.....
(হাত নাচাতে নাচাতে মনে করতে চাইছিলেন, কিন্তু সঠিক হিন্দি আর মনে পরছিল না)....ইয়ে"
"বান্স আসছিল ??"
"হ্যাঁ হ্যাঁ"
"কয়া লিখা থা উসমে, কি ছিলো ??"
"লিখা ছিল....এইটা শুধু প্রারম্ভ আমার প্রতিশোধের।
আর লিখা ছিল, এই পাড়ার একটা শিশুকেও ছাড়বে না....
ঠাকুরের কাছে খুবই আক্ষেপ আর আবদার করতাম্, আজ সন্তানহীন হয়েই যেন চিন্তামুক্ত। কিন্তু ভগবান সবাইকে যে
কি বিপদেই না ফেললে"

ফোন বাজতেই দামিনী ইতস্তত হয়ে ফোনটা তোললে।
ওপার থেকে "খানা খা লিয়া না ?? দবাইয়া লি ??"
"হাঁ জী"
"কয়া হুয়া দামিনী, সব ঠিক্ তো হে না ??"
"হাঁ পর্ সতীশ বাবু বতা রহে থে আবৃতি কি..."
"হাঁ পতা চলা, পর তুম এসি হালত্ মে ইহ সব মত্ সোচো। ঘর আকর্ বাত করতে হে।

ঠিক্ হেঁ ??"
"জী, ঠিক হে....হা"

ফোন রাখতেই বাইরে থেকে বিকট্ একটি আওয়াজ আসলো, সাথে কান্না আর চিৎকার।

সতীশ তৎক্ষণাৎ দাড়িয়েই "এ তো বিহারী বাবুর আওয়াজ...."

দুজনেই দরজায় বাইরে আসতেই.....
"বৌদি এ তো বিহারী বাবুর ছেলে"

দূর থেকে কে যেন চিৎকার করছিল "ত্রিতলা থেকে কি করে পরলো ?!"

সবাই নিস্তবদ্ধ দাড়িয়ে পড়লে.....
আর দামিনী ডান হাতটি নিজের তল্ পেট্-টায় ধরে দাড়িয়ে রইল।

*****

হরিণজন্ম

- লিটন শব্দকর

আলোর ঝলকানিতে শুভ মেরুদণ্ড দিবস
সারারাত কাঠামো থেকে চুরি যায় হাড়
যতটা নমনীয় হলে ভেঙেযায় ততটাই ভাঙে
বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে এক একটি টুকরো....

সহজলভ্য ডোরাকাটা ফরম্যাট
মৃত্যুর মৌলিক নির্ভরযোগ্যতা
চিতল হরিণ অজান্তে উপসংহার মাখে

নিজের সাথে এক উজ্জ্বল বিশ্বাসঘাতকতা
বিশ্বাস মানুষের প্রতি

হরিণজন্মের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে মনে হয়
ঘাসহীন মাঠের দৈন্যতা ঘুচিয়েছে যারা শিশিরে
তাদের ওপর অভিযোগ ভিত্তিহীন।

অনুভূতির সঞ্চয়

- সঞ্চয়িতা নাথ

কবিতাঃ পলাশ কাব্য
পৃথিবীর উচ্ছিষ্ট বহন করে কাব্য হতে চাই না আর !
চাই না রঙ বেরঙের তুলিতে ক্যানভাসে আঁকা ছবি হতে.....
কখনো পাহাড়ী ঝর্ণায় ভিজে গেছে শরীর, কখনো আলতা পায়ে নূপুরের ছন্দ, কলসী কাঁখে মেঠো পথে গাঁয়ের বধূ,
কখনো আবার নগ্ন আঁচলে ফুটিয়ে তুলিস যৌবন সিক্ত কামনার আগুন, কখনো রামধনু রঙে রাঙিয়ে দিস তৃষ্ণার্ত বুক.....
আস্ত আকাশ টা দিস নি তো কখনো !!
আমি হারিয়ে যেতে চাই তোর বুকের গহীন অরণ্যে,
পাহাড়, নদী, ঝর্ণা, রামধনু ও বৃষ্টির উষ্ণতায় ভেসে যেতে চাই তো সাথে,
নীল সাগরের অন্তহীন ঢেউয়ের প্রতিটি দোলায় হারিয়ে যেতে চাই অনন্তের খোঁজে, চাই প্রাণের স্পন্দন--,
চাই আলিঙ্গন, রক্ত মাংসের স্বপ্ন বুনতে চাই, অনুভব করতে চাই তোর হাতের ঐ রঙ তুলির স্বাদ।
চাই মেঘমুক্ত আকাশ, বাধাবিঘ্নহীন পৃথিবীর জোয়ার, তোর প্রেমের প্রেমিকা হয়ে সইতে চাই একবুক বিরহ জ্বালা,
তোর গায়ের গন্ধ ভেজা বাতাসে শীতল হতে চাই।
তোর কাঁধে মাথা রেখে ঘুরে বেড়াই পৃথিবী বিস্তৃত উদ্যান,
তোর ঠোঁট ছুঁয়ে সিক্ত হয়ে উঠুক আমার আকাঙ্খার শূণ্যতার পূর্ণতা---,
চাই না হতে আর কাব্য.....
চাই না হতে উপন্যাসের খাঁচায় বন্দী মুখরোচক চিত্র প্রদর্শনীর চিত্রাঙ্কণ....

*****

সঙ্গী

- সুদীপ্ত চক্রবর্তী

মনে পড়ে তোমার কথা-
যে হাত ছিল সব সময় কাঁধে

একা ছাড়োনি কখনও
একাকীত্বে দৃঢ়ভাবে সঙ্গ দিয়েছিলো খুব;

যাতে হারিয়ে না যাই
আগলে রাখতে তাই-

আমিও তো চাইতাম এটাই
চোখ খুললেই যাতে তোমাকে কাছে পাই-

বুকে অনেক কষ্ট লুকিয়ে
চেপে যেতে সবটাই
প্রকাশ করোনি
হাসির আড়ালে লুকোতে যাতে বোঝার ক্ষমতা হারাই;
কেমন করে বলো এতোটা শক্ত হতে পারতে ?

মনে আছে-
সেই প্রথম নিজের হাতে খাইয়ে দিয়েছিলে আমায় ?
সেই ছবিটা আজ সবচাইতে প্রিয় আমার।
খুব আশা ছিল জানো,
পৃথিবীর সব সুখ তোমায় দেবো,
সব ভালোবাসা তোমার হোক,

অভাবে কোনোমতেই দিন না কাটুক তোমার
সবটা উজাড় করে দেবো।

কিন্তু পারলাম কই ?

যে দুঃখগুলো বুকের ভেতর আটকে রেখে আমায় হাসাতে
ইচ্ছে ছিল তোমার থেকে সেই সব দুঃখগুলোকে কেড়ে নিয়ে আমার খাঁচায় পুরে দিই।

কিন্তু সময় আর সুযোগ দিল কই ?

হাত ছেড়ে মাঝপথে নিঃসঙ্গতায় ঠেলে দিলে তুমি।
কঠিন পরিস্থিতিতে একা উঠে দাঁড়াতে পারবো কিনা একবারও পেছন ঘুরে দেখলেনা।
ঠিক কেন এমনটা করেছিলে বলতে পারো ?

এত্তসব কি এই ছোট্ট দু-হাত পারে সামলাতে ?
কি করে পারলে তুমি ?

মাঝে মধ্যে খুব একা থাকতে ইচ্ছে করলে নির্জন রাস্তায় হেঁটে বেড়াই, ভাবি কোনো জাদু দিয়ে যদি আবার তোমায় কাছে পেতাম....

জানি না কোথায় আছো-কেমন আছো তুমি ?
তবে যেখানেই আছো জানি, ভালো আছো।যতদিন আমি বেঁচে থাকব - তুমিও থাকবে আমার মধ্যে লীন
তোমাকে দিয়েই তো আমার স্নেহের ও ভালোবাসার পরিচয়।

তোমার ঋণ কি করে এই জীবনে শোধ করি ?

ভালোবাসি কত্ত তা কখনও মুখ ফুটে বলতে পারিনি।

যা আগে বলা হয়নি তা এখন প্রচুর ইচ্ছে হয় বলতে;

শুধু রাত শেষে দিনের আলো ফোটার প্রাক মুহূর্তে রোজ তোমায় অনেক মনে পড়ে বাবা;
তোমায় অনেক মনে পড়ে।।

*****

আত্মঘাতী

- অনিন্দিতা দেবনাথ

সময় টা বিকেল পাঁচটা বেজে দশ মিনিট। কলেজের যাবতীয় ফাঁকিবাজি সেরে ব্যারাকপুর এর ট্রেন ধরলাম। সেদিন এর গন্তব্য - গঙ্গা নদীর তীর ! শিয়ালদহ মেন-লাইনের, ডাউন ট্রেন। আন্দাজ করাই যায়, কেমন আটোসাটো অবস্থা। তাও যেতে হবে। ওইসব সিটে বসে ট্রেন চড়ার অভ্যেস আমার নেই। দরজায় ঝুলে ঝুলে, টিপিক্যাল কাকিমাদের সাথে ঝগড়া করতে করতে যেতে হবে। ইচ্ছে করলেই টান উঠছে বলে একটু এ্যা, উ্যা করে হেঁপোরুগির নাটক করলেই দুটো সিট দখল করা যায় ! তবে পরিচিত লাইন তো। এক রোগের নাটক বারবার শ্যুটিং করা দায়।

যাই হোক, স্টেশন থেকে বেরিয়ে, ধূবি ঘাটের অটো ধরে পৌঁছে গেলাম গঙ্গা পাড়ে। সেদিন আমি একাই গেছিলাম। মাঝে মাঝে একা বেরোতে হয়, নিজেকে গোপনে জানতে হয়, আরেক জোড়া হাত ছাড়া, নিজের হাতে গাড়ি ঘোড়া সামলে রাস্তা পেরোতে হয়, ট্রাফিক সিগন্যালের কোন বাতি টা কি বোঝায় সেগুলো রপ্ত করে নিতে হয়, রিকশা কাকার সাথে দরদাম করা শিখতে হয়, নিজের সখ-আহ্লাদ পূরণের জন্য নিজের পার্সেও যে টাকা আছে সেটা জানতে হয়, সর্বোপরি একা চলা, স্বাধীনভাবে চলা শিখতে হয়।

মেন রোড থেকে, গঙ্গা নদীর পাড়ে যেতে হলে, কিছুটা হাঁটতে হয়। শিমুল পলাশের ছায়াপথ ধরে, হেঁটেই গেলাম, গিয়ে বসলাম গঙ্গা ধারে। শ্রীলেদার্স থেকে কেনা, হলুদ ব্যাগ টা থেকে জলের বোতল টা বের করে, জল খেলাম। অনেক টা পথ হাঁটতে হলো কিনা!

তারপর চারদিকে তাকিয়ে যা দেখলাম, শৈশব টা এসে আমার বর্তমানের দরজায় কড়া নেড়ে গেল।

বিকেল ঘনিয়ে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ছেলে মেয়েদের পিঠে একটা করে ব্যাগ ঝুলছে। বাইরে থেকে দেখে এবং নিজের অভিজ্ঞতায়, ব্যাগের ভেতর একটার চাইতে বেশি দুটো খাতা নেই, তা সহজেই আন্দাজ করতে পেরেছিলাম। সবাই যে যার মতো, দিনের অন্তিম মুহূর্ত গুলোকে এক একটি 'শৈশব প্রেমের স্মৃতি'-র উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করছিল। এক্সট্রা টিউশন, স্যারের বাড়ি, কম্পিউটার শেখার ক্লাস, বন্ধুর জন্ম দিন ইত্যাদি নানাবিধ মিথ্যা বাহানা দেওয়ার স্পর্ধা, এই বয়সে চূড়ান্ত শিখরে থাকে। তখনও আমরা, নিজের লাভ-লোকসানের অংক কষতে শিখি না। মা-বাবার টাকা গুলোতে আমার অধিকার আছে বলে, আমি ও যে একদিন মা-বাবা হবো সেটা বোঝার মতো গভীরতা আমাদের আসে না। যার জন্য নিজের সমস্ত কিছু উজাড় করে দিচ্ছি, আমার রোজগারের পথে সেই মানুষ টাই কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়ে একটা সময়ের পর আমার ভালো রোজগার নেই বলে অনায়াসে কেটে যেতে পারে সেটা ও আমরা বুঝিনা। সর্বোপরি নিজের পায়ে নিজেই কোড়াল মারার সর্বোত্তম বয়স টা এটাই।

সর্বোত্তম বয়স গুলোকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম, শৈশবের ভালোবাসার একটি বিকেলের অধ্যায়

কতটা অবাস্তব সুন্দর হয়, সেটা পেছন থেকে দেখলাম...অনেকক্ষণ। তারপর যে যার মতো বড়ি ফিরে গেল। আমিও আমার অস্থায়ী ঘরে ফিরলাম। বাবার পাঠানো টাকা গুলো কে গুনে গুনে রাখলাম, আগামী কাল কি কি করবো সেটার একটা তালিকা বানালাম। রান্না করলাম, খেলাম। তারপর আলো নিভিয়ে, বিভৎস আওয়াজে চলতে থাকা পাখা টাকে একটু স্লো করলাম, তারপর বালিশে মাথা রেখে শুয়ে....., অংক কষতে থাকলাম- আমার শৈশব কে উজাড় করে দেওয়া মিথ্যে প্রতিশ্রুতি গুলো এই ঠোঁটকাটা যৌবনে ফেরত দিতে হলে, সুদে আসলে মিলে ঠিক কতটা আত্মঘাতী হতে হবে।।

*****

সূর্যমুখী

- দেবারতি চন্দ রায়

জানি শুধু যাওয়া আসা আলো অন্ধকারে।
তবু হিসাবে চলি, হিসাবে কথা বলি,
সময় সময় গা ভাসাই ইচ্ছে নদীর স্রোতে।
ভাটার টানে এসে দাঁড়াই বাস্তবে।
অসময়ের সুতোয় বোনা পরিস্থিতির গামছায়,
মুছে নিয়ে মনের থেকে বিন্দু বিন্দু কথাদের,
নিংড়ে ফেলি মাটির উপর যথা সম্ভব।
শুষে নয় শুষ্ক জমি প্রায়শ্চিত্ত ভরে।
তার আঁচলে অনিচ্ছাদের বাড়বাড়ন্তে,
বর্বরতার কুঁড়ে ঘর হয় বিশাল প্রাসাদ।
ছোট্ট চারা মহিরুহ বিষবৃক্ষের ঝাড়।
চাতক পাখির মতো
কেবল একটি সূর্যমুখীর চারা
ঠায় দাঁড়িয়ে অন্ধকারে, স্তব্ধ করে চলে।
মাথা উঁচু করে বাঁচার তাগিদে,
অপেক্ষা করে তীব্র সূর্যালোকের।
প্রচন্ড তাপে পাপ শুষে নিয়ে করবে ছারখার
বজ্র বিদ্যুতের হুঁশিয়ারী সংকেতে,
আকাশ উপচানো বৃষ্টিতে চাতকের
অভিশাপ ঘুচিয়ে সবুজে সবুজ হবে সব
কথাদের কথা রেখে।

মেরুদণ্ড !

- নীলোৎপল গোস্বামী

স্পাইন সার্জন ভাঙা মেরুদণ্ড জুড়ে দিয়ে বললেন
-যাও মেরুদণ্ডটা জুড়ে দিলাম
এবার মেরুদণ্ড সোজা করে হাঁটতে চেষ্টা করো।
-একবার ভাঙলে তা কখনো জোড়া লাগেনা ডাক্তার।
-কেন ?
-দেখুননা ছিয়াত্তর বছর আগে যে মেরুদণ্ড ভাঙল, তা কি আর পচাঁত্তর বছরে জুড়েছে একটুকু ?
বরং আরো.....

আর এই অগোছালো জোড়কে আরো যতই জুড়ে ফেল ডাক্তার সে জোড়াপুকুর বা জোড়া বাড়ির মত নামেই..., মধ্যের আল ভেঙে বা দেওয়াল ভেঙে জুড়বে না কোনদিন ?
-তবু দেখো এই ভাঙা মেরুদণ্ড নিয়েই তুমি ঠিক দাঁড়াবে একদিন।

ডাক্তার চলে যেতেই নিজের দিকে তাকিয়ে এক অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল অভী।

দাঁড়িয়ে করবেই বা কী ?
ভাঙা মেরুদণ্ডের এই হাটে যে সে একা।

তবুও সে দেখল, একটা শিশু তার সামনেই হামাগুড়ি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, টলমল হলেও; নিজের পায়েই এক'পা দু'পা করে এগিয়ে আসছে আর ভুবন ভুলানো হাসিতে ভরিয়ে তুলেছে তার চারিপাশ।

*****

গল্পের শহর

- শেখর দেব

জানিস তো, এই শহর গল্পের শহর ?
সবাই নিজের মতো করে গল্প তৈরী করে,
মাঝখানের জায়গাটা ফাঁকা রেখে,
রং দিয়ে গল্প তৈরী করে।
বিভিন্ন রং-এ আবৃত্ত থাকে এই গল্প,
যা দেখতে ও শুনতে খুবই ভালো লাগে।
মনের মানুষ গুলো যখন পাশে বসে গল্প তৈরী করে
তখন এই গল্পের মজাই আলাদা।
মনে হয় যেন, গল্পতেই ডুবে যায়,
কিন্তু, ভাবতে অবাক লাগে-
এই শহরটা গল্পের শহর।
দিনের আলোয় যেমন অনেক তারার বসবাস।
তেমনি, গল্পের শহরে অনেক গল্পেরই পর্দাফাস ॥

ফসলেন সংস্থিতা

- দেবাশিস সায়ন

বন্যা কেড়েছে ভিটে মাটি ঘর
পকেট করেছে গড়ের মাঠ।
এবার আমার শরৎ কেবল-
নিভৃতে একান্তবাস।;

কালকুটের থাবায় উড়ায়-
রহিমআলির চাল।
উনুন গিয়েছে বরাকের জলে,
ফুসলানো পাহাড়ি খাল।

আনাজ গিয়েছে মাটির তলায়-
খিদের শস্যে ভূত।
গা ছমছম পাকালের দলে,
এসেছে হাজার দূত।

হারানো ভিতের বজ্র শমন,
শ্রান্ত অপরাজিতা !
এবার না হয় হোক তবে মা-
ফসলেন সংস্থিতা।

৯ শুধু ৯ নয়

- পুষ্পা দাস

সংখ্যা আমাদের কমবেশি সকলেরই জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে আমার আগ্রহ বরাবরই বেশি। বিশেষ করে ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ অংক নিয়ে আর তার গহনে জমানো রহস্য খুঁজতে গিয়ে যা যা পেয়েছি, জেনেছি, শিখেছি, তার মধ্যে অন্যতম ৯। তাই সেই ৯ সংখ্যার সম্পর্কে এখানে আলোচনা করছি।

আমাদের হিন্দুধর্মে ৯ সংখ্যার গুরুত্ব অপরিসীম। বিভিন্ন পুরাণে নানারকম ভাবে ৯ সংখ্যাটির ব্যবহার দেখা যায়। এই ৯ সংখ্যাটি শক্তির কথা মাথায় রেখেই হয়তো ঋষি ব্যাস ৯টি পুরাণ, এবং ১০৮টি (১ + ০ + ৮ = ৯) মহাপুরাণ তৈরি করেছিলেন।

বিভিন্ন তথ্যসূত্র থেকে প্রাপ্ত ৯ সংখ্যাটির মহিমা জানতে নিচের আলাচনায় দৃষ্টি দেওয়া যাক।
১. হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী স্বর্গের সংখ্যা ৯ । পুরাণে অনেকবার ব্রহ্মার সংখ্যার উল্লেখ করা হয়েছে আর সেটি হচ্ছে ৯। পুরাণ অনুসারে ৪টি যুগ রয়েছে।

সত্যযুগ - ১৭২৮০০ বছর (১ + ৭ + ২ + ৮ + ০ + ০ = ১৮ আবার ১ + ৮ = ৯)

ত্রেতাযুগ - ১২৯৬০০০ বছর (১ + ২ + ৯ + ৬ = ১৮ আবার ১ + ৮ = ৯)

দ্বাপরযুগ - ৮৬৪০০০ বছর (৮ + ৬ + ৪ = ১৮ আবার ১ + ৮ = ৯)

কলিযুগ - ৪৩২০০০ বছর (৪ + ৩ + ২ = ৯)

এছাড়া ৯টি গ্রহ, ৯টি পবিত্র দেবী স্থল, ৯টি শুভরাত্রি যা নবরাত্রি নামে পরিচিত। হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা অনুসারে আমাদের ছায়াপথে ২৭টি নক্ষত্রমণ্ডল রয়েছে। (২ + ৭ = ৯) অর্থাৎ সমস্ত উল্লেখিত সংখ্যাকে যদি যোগ করে এক অঙ্কে নিয়ে আসি প্রাপ্ত অঙ্ক হয় ৯ ।

২. ৯ এমন একটি সংখ্যা যা একাই এবং সর্বশক্তিমান। ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ অংকগুলিকে যদি যোগ করে একঅঙ্কের সংখ্যায় নিয়ে আসা হয় তবে প্রাপ্ত মান হবে ৯।
৩. আরোও মজাদার ব্যাপার হয় ৯ কে ৯ এর সঙ্গে যোগ করতে থাকলেও প্রাপ্ত যোগফলগুলিকে আবার একঅঙ্কে নিয়ে আসলে পাওয়া যাবে শুধুমাত্র ৯।
যেমন-

৯ + ৯ = ১৮ (১ + ৮ = ৯)
১৮ + ৯ = ২৭ (২ + ৭ = ৯)
২৭ + ৯ = ৩৬ (৩ + ৬ = ৯)
৩৬ + ৯ = ৪৫ (৪ + ৫ = ৯) এবং ক্রমশ চলবে

৪. ৯ অংকটির সঙ্গে যেকোনো অংক গুণ করলে যে গুণফল পাওয়া যায়, প্রাপ্ত সংখ্যাগুলিকে যোগ করে এক অঙ্কে নিয়ে আসলে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায় তা সর্বদাই ৯ হয়।

যেমন- ৯ × ৩ = ২৭ (২ + ৭ = ৯)
৯ × ৭ = ৬৩ (৬ + ৩ = ৯)
৯ × ২২৫ = ২০২৫ (২ + ০ + ২ + ৫ = ৯)

৫. তেমনি ৯ কে অর্ধেক করতে থাকলেও প্রাপ্ত সংখ্যাগুলি কে এক অঙ্কে নিয়ে আসলে ৯ - ই পাওয়া যাবে।

যেমন- ৯ ÷ ২ = ৪.৫ (৪ + ৫ = ৯)
৪.৫ ÷ ২ = ২.২৫ (২ + ২ + ৫ = ৯)
২.২৫ ÷ ২ = ১.১২৫ (১ + ১ + ২ + ৫ = ৯)

৬. জ্যামিতিক আকারে মহাবিশ্বকে গোলাকৃতি বা বৃত্ত এর সঙ্গে তুলনা করা হয়। আমরা জানি বৃত্তের পরিমাপ ৩৬০° (৩ + ৬ + ০ = ৯) বৃত্তকে অর্ধেক করে যা পরিমাপ করা যায় তা ১৮০° (১ + ৮ + ০ = ৯)। ১৮০° -কে অর্ধেক করলে পাওয়া যায় ৯০° (৯ + ০ = ৯)। ৯০° -এর অর্ধেক ৪৫° এবং এরও অর্ধেক ২২.৫ এবং ক্রমশ যতদূর করা যায় সবগুলির যোগফলই ৯ হয়।

৭. ১ ঘন্টা = ৩৬০০ সেকেণ্ড (৩ + ৬ = ৯)
২৪ ঘন্টা = ৮৬৪০০ সেকেণ্ড (৮ + ৬ + ৪ = ১৮
১ + ৮ = ৯)
১ বছর = ৩৬৫.২৫ দিন (৩ + ৬ + ৫ + ২ + ৫ = ৯)

৮. সুস্থ ব্যক্তি দিনে ২১৬০০ টি শ্বাস নেয় যা আবারও যোগফল এর পরে (২ + ১ + ৬ = ৯) সংখ্যা হয়।

মহাজাগতিক শক্তির অধিকারী ৯ সংখ্যাটি একক এবং সর্বশক্তিমান। যা নিয়ে আলোচনা থেকে যাবে। ৯ সংখ্যাটি আবার ৩ ও ৬ সংখ্যার কম্পনের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে কাজ করে। যা নিয়ে বিশদ আলোচনা পরে করা যাবে। সর্বকালীন বিখ্যাত বিজ্ঞানী নিকোলা টেসলার ভাষায়-

‘‘If you only knew the magnificence of 3, 6 and 9 then you would have a key to the universe.”

*****

অপেক্ষা

- রাজর্ষি ভট্টাচার্য

আজ বিকেলটা প্রথম থেকেই যেন এটা মনমরা। এক ভ্যাপসা গরম গত কয় দিন থেকেই শহরের উপর চেপে বসেছিল, আজ যেন তার উৎপাত টা একটু বেশীর দিকে। ভিড়ের রাস্তা ঠেলে এগিয়ে যেতে যেতে বাইকে বসেই ঘামছিল শুভ্র।

অন্তরার সাথে শেষ দেখা হয়েছিল বছরখানেক আগে। একসাথে চাকরি তে ঢুকেছিল দুইজন, যদিও বছর খানেক পরেই চাকরিটা ছেড়ে দেয় অন্তরা। "বাড়ি থেকে এতটা দূরে, একদমই ভাল লাগছে না রে," শেষের দিন বলেছিল ও। শুভ্র সেদিন ভেবে পায়নি কি করবে, কিভাবে আটকাবে তাকে, বদলে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল অন্তরার চলে যাওয়ার দিকে। সেদিন অফিস শেষ হবার পরেও অনেকক্ষণ বসেছিল শুভ্র। চেষ্টা করছিল কষ্টের ডেলাটাকে গলা বেয়ে উপরে উঠতে না দেবার।

এখন রাস্তায় বিরক্ত হচ্ছিল শুভ্র। আজ যেন ভাগ্যও ওর সাথে নেই, একটার পর একটা লাল বাতি তে আটকাচ্ছে, সামনের লম্বা গাড়ি ও বাইকের লাইন যেন শেষ হবার নামই নেই। বিরক্ত হয়ে হাতঘড়ির দিকে তাকায় শুভ্র, ছটা বাজতে আর দশ মিনিট, কপাল ভাল থাকলে এখনও সময়মত পৌঁছে যেতে পারে, অন্তত আজ অন্তরাকে অপেক্ষা করাতে চায় না ও।

"এতটা বেখেয়ালি হয়ে চলে ?" বলেছিল অন্তরা, ওর ভাড়া বাড়ির সামনে রাস্তায় দাড়িয়ে। কিছু না বলে কান এঁটো করে হেসেছিল শুভ্র, প্রথম দিনেই দশ মিনিট দেরি। দোষ খুব একটা তার ছিল না যদিও, কি পরে আসবে তা ঠিক করতেই কেটে যায় অনেকক্ষণ, প্রথম দিন দেখা, একটু ফিটফাট হয়ে আসাটাই তো দস্তুর। একসাথে অফিসে যাবার প্রস্তাব টা শুভ্র দেয় চাকরি তে জয়েন করার পরের দিনই। "আরে, তুমি তো থাকো আমার বাড়ির পাশেই, আপত্তি না থাকলে সকালে আমি তোমাকে পিক করে নিতে পারি," বলেছিল সে। "দেরি করা চলবে না কিন্তু," হেসে জবাব দিয়েছিল অন্তরা।

তার পর থেকে প্রতিদিন তারা একসাথে অফিসে আসত, একসাথে বাড়ি ফিরত। অন্তরার কোনোদিন কোন কারণে দেরি হলে অপেক্ষা করত শুভ্র, তার দেরি হলে আরও কাজের বাহানায় বসে থাকত অন্তরা। রবিবার ছুটির দিন টা বড় অস্বস্তিতে কাটত শুভ্রের। সোমবারের অধৈর্য অপেক্ষা তাকেই অবাক করত। চিরকালের অলস শুভ্রের এই পরিবর্তন নজর এড়ায়নি তার বন্ধুদেরও। "নির্ঘাত প্রেমে পরেছিস," বলাবলি করত বন্ধুরা, আর তার প্রতিবাদ করার খুব চেষ্টা করলেও কোথায় যেন আটকে যেত ও।

ধীরে ধীরে ছুটির দিনের সেই একাকীত্ব অন্তরাও অনুভব করতে থাকে। এক রবিবার শুভ্র কে ফোন করে কফি খেতে যাবার আমন্ত্রন দিলে সেও আপত্তি করতে পারে না। কফির পর সিনেমা, তারপর রাতের খাবার খেয়ে ফেরত আসা টা খুব অল্পদিনেই দুজনের অভ্যাসে পরিণত হয়। অন্তরা লম্বা ছুটিতে বাড়িতে গেলে দিনগুলো কিভাবে কাটত তা শুধু শুভ্রই জানে, আবার তাকে ছাড়া অন্তরাও যে খুব ভাল থাকত না, তা দুজনেরই অজানা ছিল না।

সম্পর্কের নমনীয়তা বাড়তে থাকে সময়ের সাথে সাথে, তুমি থেকে তুই হতেও তাই খুব একটা দেরি হয়না। কিন্তু প্রতিদিনের একসাথে থাকার চাহিদার সাথে সাথে বাড়তে থাকে কাজের চাপও। ছুটোছুটি বাড়তে থাকে দিন দিন, শুভ্রের অফিসের বাইরে, অন্তরার অফিসের ভেতরে। এক রবিবারে অতিরিক্ত কাজের জন্য অফিসে আটকে যাবার পর পরের রবিবার দেখা না করার সিদ্ধান্ত নেয় দুজনই। ছুটির দরকার হয় শরীর আর মনের, কিন্তু এর সাথেই যে লুকিয়ে উঁকি মারে দূরত্ব বাড়ার অবধারিত লক্ষণ, তা নজর এড়িয়ে যায় দুজনেরই।

কাজের ফাঁকে অফিসে দেখার সময় তাদের কথা জুড়ে থাকে কাজের আলোচনা, অফিসের পর দেখা হলে তাতে থাকে কলিগদের নিয়ে গল্পগাছা। খুব তাড়াতাড়ি দুজনের নিজস্ব সময়ে ভাগ

বসাতে থাকে কর্মক্ষেত্র, যা তারা বুঝতেও পারে না। অফিসের গল্পের সাথেই আসতে থাকে এক অবসাদ, এক নির্লিপ্তি, সম্পর্কে প্রথম মেঘের ছায়া পরে তাদের।

সেই মেঘের প্রভাব বুঝতে দেরি করে দুজনেই। খুব ধীরে সেই মেঘ দখল করে নেয় তাদের পুরো আকাশটাকেই। "সামনের সপ্তাহে বাড়ি যাচ্ছি রে, এবার ফিরতে দেরি হবে একটু, ফোন হয়ত খুব বেশি করতে পারব না, অনেক কাজ আছে বাড়িতে," একটানা বলে থেমেছিল অন্তরা। কিছু না বলে মাথা নেড়েছিল শুভ্র, "চল, তোকে বাড়ি পৌঁছে আমাকে আবার বেরোতে হবে একবার", বলেছিল সে। সেদিন তার বাইকের পিছনে বসে অন্তরার চোখের দু ফোঁটা জল নজরে পরেনি শুভ্রের, পড়লে হয়ত আটকে রাখত অন্তরাকে, এত সহজে যেতে দিত না।

সেই ছুটির পরই তাল কেটে গিয়েছিলো, এটা বুঝতে পারে তারা। কিন্তু এগিয়ে এসে সম্পর্ক মেরামতির দায়িত্ব নেয় না কেউই। কাজ চলতে থাকে কাজের নিয়মে, সম্পর্কের ভাঙ্গন ও বাড়তে থাকে এর সাথে সাথে। দুজনের পারস্পরিক সময় কমতে থাকে, বাড়তে থাকে দূরত্ব। এমনই এক দিনে অন্তরা জানায় যে সে চাকরি ছেড়ে দিচ্ছে। "বাড়ি থেকে এতটা দূরে, একদমই ভাল লাগছে না রে," বলেছিল অন্তরা, "চাকরিটা আমি ছেড়ে দিচ্ছি, বাড়ি গিয়ে ঠিক করব এর পরে কি করা যায়।"

সে দিনের পর কেটে গিয়েছে আস্ত একটি বছর, অন্তরার যাবার পর শুভ্র ও চাকরি ছাড়ে, জয়েন করে আরেক অফিসে। দুজনের মধ্যে সম্পর্কের তারটা ছিঁড়ে যায় হঠাত করেই। কিছুদিন আগে শুভ্রের মোবাইল এ কল আসে একটি, অচেনা নম্বর, ফোন তুলে দেখে ওপারে অন্তরা, "কেমন আছিস," জিগ্যেস করে ও।

"ভালো", কোনোমতে বলে শুভ্র।

"সামনের সোমবার আসছি, দেখা করিস," বলে অন্তরা।

"হঠাত কি মনে করে ?" জিগ্যেস করে শুভ্র।

ওপাশে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা নেমে আসে। অনেকক্ষণ পরে হালকা একটা জবাব ভেসে আসে, "আমার বিয়ে," তারপর আবার একযুগের নীরবতা, "শেষ বারের মত একবার দেখা করতে চাই।"

ভেতরে কিছু একটা ভাঙছে টের পেলেও শান্ত থাকে শুভ্র, জেনে নেয় দেখা করার জায়গা আর সময়, কথা দেয় ঠিক সময়েপৌঁছে যাবার, আর তারপর ফোন কেটে দেয়। ফোন কাটার পর স্তব্ধ হয়ে সে বসে থাকে কিছুক্ষণ। অনেকটা সময় কিভাবে পেরিয়ে গেল তা বুঝতেও পারল না, যেন এক শতাব্দী পরে জেগে উঠে সে। গিয়ে দরজা বন্ধ করে আবার বিছানায় এসে বসে, আর একটা সময় কালবৈশাখীর ঝড়ের মত ভেঙ্গে পরে বিছানায়।

পর পর তিনটে সিগন্যালে লাল বাতি পেরিয়ে শেষমেশ শুভ্র এসে পৌঁছয় তাদের দেখা করার জায়গায়, সেই ক্যাফে তে যেখানে সে প্রথম নিয়ে এসেছিল অন্তরাকে। বাইক টা পার্ক করানোর জন্য পাশের ছোট্ট গলিতে ঢোকার সময় শুভ্র দেখতে পায় অন্তরাকে। অন্তরা একটি অটো থেকে নামছে, একটি হাল্কা সবজ শারি পরিহিতা অন্তরা যেন আজও সেই আগের মত সময় দাড় করিয়ে দিতে পারে। শুভ্র দেখতে পায় অন্তরার হাতে একটি ছোট ব্যাগ, আর একটি লাল খাম। সে বুঝতে পারে খামের ভেতরে অন্তরার বিয়ের চিঠি অবশ্যম্ভাবী উপস্থিতি। বুঝতে পেরে শুভ্র যেন আর নড়তে পারে না, তার পা গেঁথে যায় শক্ত কংক্রিটের রাস্তায়, ঝাপসা হয়ে আসে চারপাশ, অন্তরা ছাড়া আর কাউকে দেখতে পায় না সে। তার পৃথিবী জুড়ে এখন এক হালকা সবুজ বৃষ্টি, যেখানে আর কিছুই নেই তার নিজস্ব। শুভ্র দাড়িয়ে থাকে সেখানে, হেলমেট আর মাস্ক না খুলে, দাড়িয়ে থাকে অন্তরার থেকে কয়েক যোজন দূরে, সে জানে, এই দূরত্ব এই জীবনে সে আর পেরোতে পারবে না, এই জীবন নাহয় এখানেই থাক, এই ধূসর সমুদ্রের একপাশে সে, আর এক পাশে অন্তরা। নিঃশব্দে নিজের বিদায় জানায় শুভ্র তার বাইকে চেপে বসে, আর ক্যাফের সামনে অন্তহীন অপেক্ষায় রেখে যায় আর এক জীবনের অন্তরাকে।

সোনার হরিণ

- সৌম্যদীপ চক্রবর্তী

বয়ে যাওয়া শরৎকালীন আবহ
নিয়ে আসে তার বার্তা।
প্রবাহে থাকে তার কোমল পরশ
যা করে আমায় স্নিগ্ধ
হই আমি স্বচ্ছ।
তারই প্রতিচ্ছবি উঁকি মারে
মেঘের আড়ালে
বলে যায় মধুর বাণী।
বলছি আমি যার কথা
ছুটে বেড়াচ্ছে সে।
ভয়ভীতি কে করেছে সে জয়
হয়েছে সে আমার হৃদয়ের মধ্যমনি।
মেলেছে সে যে নিজের পাখনা
নামটি তাহার সোনার হরিণ।।

তোমার বাসা।

- শম্ভু শংকর চক্রবর্তী

ভেসে বড়ায় সেই মানুষ
নিরাগ কাটে এক ঝাপটায়
কি অদ্ভুত স্পর্শ
আমার কান, কপাল, ঘাড়, গলায়।

লহমায় আবদ্ধ হই
থেকে থেকে ঘুমিয়ে পড়ি
আহ্ ! সেই গান সোনায়
কোনো আড়ালে চুপিসারে সরগম ধরি।

জানালার কাচে মিটিমিটি জোনাকী
ভোরের কুয়াশার ছবি আঁকা
আমার ঘরে তখন মিরজাগালিব
আর বুকের ঘরে তোমার বাসা।

অন্য দুর্গা

- সপ্তদীপা দেবনাথ

এক দুর্গার আরাধনায়
মর্ত্যবাসি মাতে,
অন্য দুর্গার অশ্রু ঝরে
অত্যাচারের আঘাতে।
এক দুর্গার আগমনে
সকলে উদ্ভাসিত,
অন্য দুর্গার জন্ম হলে
পরিবার হয় দুঃখিত।
এক দুর্গার দশ হাতে
অসুর বধের অস্ত্র,
মানুষরূপী অসুর কাড়ে
অন্য দুর্গার বস্ত্র।
এক দুর্গার মন্দিরেতে
পুরুষ করে পূজা,
অন্য দুর্গা শুধুই সহে
লাঞ্ছনার বোঝা।
এক দুর্গা পূজিত হয়
জগৎ সংসারে,
অন্য দুর্গার ঠাই হয়
বৃদ্ধাশ্রমের দ্বারে।

স্বপ্ন

- মাম্পি দে

নিঝুম নিশ্চুপ রাতে
এলোমেলো চোখের পাতা।
মুঠো মুঠো স্বপ্নগুলি
শুধু মনের আয়নায় দেখা।
কখনো বা কিছু অতিথ
নয়তো কিছু ভবিষ্যৎ-
নয়তো বা বর্তমানের
কিছু পাওয়া না পাওয়া।
রাতের প্রতিটা প্রহর চলে যায়
স্বপ্নগুলি ছেড়ে যায় না আমায়।
অহরহ মনের কোণে উঁকি ঝুঁকি,
হাঁসি কান্না আর অভিমানে।
এমন করে চলে দিবস ও রজনী
কোন একদিন চলে যাবও আমি।
স্বপ্নগুলি রেখে যাব কবিতার পাতায়
যেদিন থাকবো নাকো আর আমি।

প্রকৃতির কোলাহল

- দেবত্র ভট্টাচার্য্য

প্রকৃতি এক অনন্য সৃষ্টির নিদর্শনের চিত্রপট,
প্রকৃতির কোলাহলে-ই উজ্জীবিত হয় সৃষ্টির মহামায়া
প্রকৃতির সুকোমলতা মানবমনের এক অনন্য রূপকার
প্রকৃতিরস্নিগ্ধ পরিবেশে প্রবাহমান হয় এক নন্দনকানন,
প্রকৃতির এই রদ বদলে উদ্ভাসিত হয় শত শত ক্যাকটাস,
প্রকৃতির ব্যাপয়মানে সৃষ্টি হয় শত শত বারুদের ঘ্রাণ
প্রকৃতি তার স্বমহিমায় বিরাজমান এই ধরনীতে।
প্রকৃতি সময়রে পরিবর্তনের সাথে সাথে রূপ বদলায়-
হঠাৎ শান্ত ও রুদ্র মূর্তি ধারণ করে।
প্রকৃতির এই সুকোমলতা আনন্দের বার্তা বহন করে,
সুর, ঝংকারে প্রতিফলিত হয়ে রামধনুর
সাতটি রঙে, আলোকিত হয় এই প্রকৃতি।

কিস্তি মন

- দেবজ্যেতি আচার্য্য

তোমার পুরুষ কাব্য
বড়োই বেমানান....
ভাষায় আটকে না...
স্টলের কেটলি আর নিকোটিন গন্ধে সময় কাটে না...
শরৎ পিচ্ছিল কাশফুলবনে তোমাকে হারালাম আবার
ধস্তাধস্তি ভাবনা কিস্তি মন কভার।

এই জীবৎকালে

- মিতালী দে

যতখানি রাগ আছে ঘেন্না আছে
গালি গালাজ আছে যত,
ধাক্কার জোরালো সঙ্গতে অর্গলবদ্ধ
ঘন আঁধারে
জমা থাক, আঁধারে
আঁধারের বীজ, আঁধার ফুল,
আঁধার ফলে ভরপুরন্ত
ইবলিসের সংসার।
ঋতী নক্ষত্রের জলে স্নান,
নীলকণ্ঠ পাখির পালক কুড়িয়ে,
পথ চলা প্রমিথিউসের পেছনে
অপার আশ্বাস বাণীতে জীবন
শ্রীচৈতন্যের নাম সংকীর্তনের
বিদ্বেষহীন সুরে, ভালোবাসার টানে
ভালোবাসার ঘরে।

মানসিক শান্তি

- দীপালোক ভট্টাচার্য

দূর দূরান্তে আমি একা-
চারিদিক নিঝুম রাত
জোনাকির আঁকা সরু পথ,
উড়ে যেতে চায় দিক থেকে
দিগন্তরে।
চারিদিক কোলাহল-
বিপদ হুঙ্কার কড়া নাড়ে,
বাঁচাতে চাই শত প্রাণ,
হাহাকারে তার চারিদিক উন্মাদনা।
বাঁচতে চায় সে বাঁচতে দাও।
দিনের শেষে শেষ রঙিন হাসিটা
তোমার দেওয়া মনমুগ্ধকর স্পন্দন।
জীবনের সংগ্রামে নেই যে পিছুটান
বাঁচতে চায় সে তাকে বাঁচতে দাও-
উড়ে যেতে চায় সে নীলাম্বরের
হাত ছানির চড়া পথে।
তাকে বাঁচতে দাও।

লৌহ মানব বল্লভভাই ও অক্টোবর

- রণজিৎ পুরকায়স্ত

"জনগণ ঐক্য বিধায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা।"

হ্যাঁ সেই ভারত ভাগ্যবিধাতাকে আমরা স্মরণ করতে যাচ্ছি যিনি ভারতকে একসূত্রে গেঁথে ছিলেন। যার প্রখর বিচার বুদ্ধি আজকের ভারতের জন্ম দিয়েছিল। সেই 'লৌহমানব', সর্দার বল্লভভাই জাভেরভাই প্যাটেল আমাদের আজকের আলোচনার কেন্দ্রে আছেন। সেই মহান ব্যক্তিত্বের জন্মদিন দিনটি "রাষ্ট্রীয় একতা দিবস" হিসাবে চিহ্নিত।

১৮৭৫ এর ৩১শে অক্টোবর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সেই হিসেবে ১৪৭ বৎসর পরে বসেও আমরা কথা বলছি সেই লোকটিকে নিয়ে। পাকিস্তান, চীন সহ বিভিন্ন প্রতিবেশী দেশ যখন লাগাতর, ভারতকে আজকের দিনে দুর্বল করার চেষ্টা করছে, দেশের একতা বিঘ্নিত করে দেশকে দুর্বল করার জন্য বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি সদা তৎপর। জাতিগত, ধর্মীয় বিভেদ তৈরী করার চেষ্টা চলছে সেই পরিস্থিতিতে বল্লভভাই এর চর্চা ভীষণ প্রাসঙ্গিক।

বোম্বে প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুজরাটের নাদিয়াদ জেলায় তাঁর জন্ম হয়। তাঁর আরও চার ভাই- সোনাভাই প্যাটেল, নারসিভাই প্যাটেল, বিঠ্ঠলভাই প্যাটেল, কাশীভাই প্যাটেল ও এক বোন দহিবেন ছিলেন। মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়। এক ছেলে ও এক মেয়ে যথাক্রমে অভয় প্যাটেল ও মনিবেন প্যাটেল এর জন্ম হয়। এতো কম বয়সে বিয়ে হওয়ায় ২২ বৎসর বয়সে মাত্র দশম শ্রেণী উত্তীর্ণ হন। ১৬ বৎসরের বিবাহিত জীবন শেষ হল তাঁর স্ত্রীর দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে। পারিবারিক আর্থিক দুরাবস্থার জন্য একসময় নিজের শখের আইন নিয়ে পড়াশুনা বাদ দিয়ে দেন। কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যু তাকে গভীরভাবে ভারাক্রান্ত করে তোলে। এই সময়ে লন্ডনের middle temple, inns of court, এ ব্যারিস্টারী পড়তে চলে যান। ৩ বৎসরের কোর্স মাত্র আড়াই বৎসরে শেষ করে চলে আসেন। ভারতে এসেই ব্যারিস্টারী প্রাকটিস শুরু করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই অত্যন্ত নামকরা উকিলে পরিণত হন। রাজনীতি নিয়ে নিরুৎসাহী বল্লভভাই বন্ধুদের উৎসাহে আমেদাবাদের কর্পোরেশন নির্বাচনে অংশ নেন এবং জয়লাভ করেন। কিভাবে জীবনের মোর ঘুরে গেলো। তখন তিনি সুট বুট পড়া একজন সাহেব।

গান্ধীজির নরম পন্থায় বল্লভভাই মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। কিন্তু চম্পারণ সত্যগ্রহে গান্ধীজির ভূমিকা তাঁকে আকৃষ্ট করে। আমেদাবাদে বোম্বে প্রেসিডেন্সির কনফারেন্স এ গান্ধীজির সাথে প্রথম সাক্ষাত হয় বল্লভভাইয়ের। সেখানে Resolution of loyality to the british king অর্থাৎ ভারতবাসীকে ব্রিটিশ রাজার প্রতি একান্ত অনুগত থাকতে হবে। গান্ধীজি সেখানই এই resolution ছিঁড়ে ফেলে দেন। এই ঘটনা বল্লভভাই কে খুব প্রভাবিত করে। তিনি ও কোট টাই ছেড়ে ধুতি পাঞ্জাবী পড়তে শুরু করেন।

১৯২৮ সালে গুজরাটের বারদৌলি জেলায় কৃষকের ফসল নষ্ট হয়ে যায়। অথচ ইংরেজ রা সেই সময় তাঁদের কর ৬% থেকে বেড়ে ২২% এ নিয়ে যায়। একদিকে ফসল নেই অন্যদিকে এই কর বৃদ্ধি কৃষকদের বিপদে ফেলে দেয়। তারা গান্ধীজির কাছে যায়। গান্ধীজি কৃষকদের সমস্যা দেখার জন্যে বল্লভভাই কে দায়িত্ব দেন। কৃষকরা কর না দেয়ায় ইংরেজরা তাঁদের ঘর জমি নিলাম করে নিতে চায়। কিন্তু আইন জীবি বল্লভভাই জানতেন যে কৃষক দের সই বা টিপ ছাপ ছাড়া জমি নিলাম করতে পারবে

না। তিনি খবর নিতে লাগলেন কোনদিন কোন কৃষকের জমি নিলাম হবে আর সেইদিন সেই কৃষককে বাড়ি থেকে সরিয়ে দিতে লাগলেন। এভাবে যখন যে কৃষকের জমি নিলাম হবে সেই কৃষক গায়েব। কর ও জমি কোনোটাই না পেয়ে ইংরেজরা একসময় দিশেহারা হয়ে ২২% থেকে কর ৬% নিয়ে আসে। বল্লভভাই এর বুদ্ধিমত্তায় বারদৌলির কৃষকরা সেবারের মতো রক্ষা পায়। তারা খুশি হয়ে বল্লভভাইকে তাঁদের সর্দার মেনে নেয়। সর্দার অর্থাৎ চিফ বা Leader of the community। সেদিন থেকেই তাঁর নাম হয় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল।

তিনি বুঝতে পেরেছিলেন জিন্নার নেতৃত্বে একদল মুসলমান আলাদা রাষ্ট্র চাইছে যা না হলে ভতৃঘাতী দাঙ্গা মিটবে না। তাই তিনি পাকিস্তান হবার পক্ষই অবলম্বন করেন। যাইহোক যখন মাউন্টব্যাটন বাটোয়ারা করতে উভয় পক্ষকে ডাকলেন তখন পাকিস্তান এর পক্ষে এলেন জিন্না আর ভারতের পক্ষে পাঠানো হলো বল্লভভাইকে। কেননা তার লৌহ দৃঢ় মানসিকতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের দৃঢ়তা, দুরন্ত দুঃসাহস আর সত্যভাষন অপ্রিয় আর রূঢ় ভাবে রাখতে পারতেন। প্রথমেই জানিয়ে দিলেন সমান সমান ভাগ হবে না। কারণ ভারতের চার ভাগের এক ভাগ পাকিস্তান। তাই ভাগ হবে ৮০:২০। সেই ফর্মুলাতে ভাগ হয়ে গেলো। দেশ ভাগের পর যেসব মুসলমান ভারত কে ভালোবেসে ভারতেই থেকে গেলো তাঁদের কে তিনি আগলে রাখার প্রতিজ্ঞা করলেন। সে সময় লাহোর থেকে যে ট্রেন আসতো তাতে হিন্দুদের লাশ ভর্তি থাকতো আর অমৃতসর থেকে যে ট্রেন লাহোর যেত তা মুসলমান দের লাশে পূর্ণ থাকতো। বল্লভভাই হযরত নিজামুদ্দিন এ গিয়ে বললেন যারা ভারত কে ভালোবেসে ভারতে থাকতে চায় সেসব মুসলমানদের রক্ষার দায়িত্ব আমি নিলাম। সেজন্যে আমার দেখেছি রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের উগ্র হিন্দুত্ববাদ তত্বও তাঁর পছন্দ হয় নি।

বল্লভভাই নেহরু কে নিজের ছোট ভাইয়ের মতো ভালোবাসতেন। আর নেহেরুও দাদার মতো। তাই তো ১৯৫০ সালে হৃদরোগে হঠাৎ বল্লভভাই এর মৃত্যু হলে নেহেরু দারুনভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। এমন কি বল্লভভাইয়ের সন্তানদের দেখাশোনার পুরো দায়িত্বটা নেহেরু গ্রহণ করেছিলেন। তবে হ্যাঁ, ১৯৪৬ সালে যখন ইংরেজ ক্ষমতা হস্তান্তর এর প্রস্তুতি নিচ্ছিলো তখন জাতীয় কংগ্রেস এর অধিবেশন এ গান্ধীজি বলেন এবার যিনি জাতীয় কংগ্রেস এর সভাপতি হবেন তিনিই স্বাধীন দেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন। তাই গোপন ভোটের ভিত্তিতে সভাপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দেখা যায় বল্লভভাই সবচেয়ে বেশি ভোট পান। কিন্তু জওহরলাল প্রধানমন্ত্রী হতে ইচ্ছুক। গান্ধীজি দেখলেন দলে ভাঙ্গন ঠেকানো দরকার তাই বল্লভভাই কে বলেন তিনি যেন নেহেরু কে প্রধানমন্ত্রী হতে দেন। ব্যাস অমনি রাজি হয়ে গেলেন বল্লভভাই।

প্রায় ৬৬৫ টি প্রদেশে বিভক্ত ভারত কে একসূত্রে গাঁথা অনেক কষ্টসাধ্য ও দূরদর্শীতার পরিচায়ক। স্বাধীন ভারতের প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল প্রথমেই ঘোষণা দিলেন যেসব রাজ্য বা জায়গীর পাকিস্তানে যেতে ইচ্ছুক তারা চলে যেতে পারে আর যারা ভারতে থাকতে চায় তারা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যেন যোগ দেয়। দেখা গেলো হিন্দু প্রধান সব রাজ্য ভারতে যুক্ত হলো আর মুসলিম প্রধান সব রাজ্য পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হলো। সমস্যা দেখা দিলো রাজস্থান, কাশ্মীর, গুজরাটের জুনাগর ও হায়দ্রাবাদ কে নিয়ে। রাজস্থান, জুনাগর পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হতে চাইলো, কাশ্মীর ও হায়দ্রাবাদ আলাদা রাষ্ট্র হতে চাইলো। এই পরিস্থিতিতে অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দেন বল্লভভাই। কোথায়ও শাসন, কোথাও কূটনীতি কোথাও কঠোরতার, কোথাও মৈত্রীর নীতি অবলম্বন করেন। রাজস্থান ছিল দিল্লির একদম কাছে। দেশের রাজধানীর কাছে অন্য রাষ্ট্র থাকলে নিরাপত্তার

সমস্যা দেখা দেবে তাই রাজস্থান কে কোনভাবেই পাকিস্তানে যেতে দেয়া যাবে না, এদিকে যোধপুরের রাজা হনুমান সিং পাকিস্তান এর প্রধানমন্ত্রী জিন্নার সাথে দেখা করেন। জিন্না তাঁকে সব রকমের সহায়তার আশ্বাস দেন। যোধপুর ছিল রাজস্থান এর প্রধান জায়গীর। তাই সবাই যোধপুরের সাথে গেলো। বল্লভভাই যোধপুরের রাজা হনুমান সিং কে দিল্লিতে ডেকে পাঠালেন। বললেন- 'তোমার বাবা আমার খুব ভালো বন্ধু ছিলেন। রাজস্থান হিন্দু প্রধান অঞ্চল তুমি তাঁদের নিয়ে কেন পাকিস্তানে যেতে চাইছো। এক্ষুনি তুমি যদি ভারতের সাথে যুক্ত হবার চুক্তি পত্রে সই না করো আমি তোমাকে পিতার মতো এমন শাস্তি দেবো যে তুমি উঠে দাঁড়াতে পারবে না।' হনুমান সিং বুঝলেন ঘোর বিপদ তিনি ভারত ভুক্তির পক্ষে সই করলেন। রাজস্থান ভারতে যুক্ত হলো। এখানে শাসনের মাধ্যমে কাজ হাসিল করেন।

তবে জুনাগড় ভারত ভুক্তির পিছনে অন্য নীতি অনুসরণ করেন বল্লভভাই। জুনাগড় এর নবাব ছিলেন মুসলমান আর জনসাধারণ ছিলেন হিন্দু। গুজরাটের জুনাগড় এর নবাব যখন পাকিস্তান এর সাথে যুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন তখন সর্দার বল্লভভাই নবাবের সাথে কোন কথা না বলে সেখানকার প্রভাবশালী হিন্দু জায়গীরদার দের সাথে কথা বলেন। তাঁদের বোঝাতে থাকেন তোমাদের মুসলমান নবাব যদি পাকিস্তানে যেতে চায় যাক, তোমরা হিন্দুরা কেন পাকিস্তানে গিয়ে পরাধীন হয়ে থাকবে। তোমরা সম্মানের সাথে ভারতে থাকো। জায়গীরদাররা দেখলো ব্যাপার তো ঠিক। তারা নবাবের বিরোধিতা করলো। তারা পাকিস্তানে যাবে না। বল্লভভাই বললেন তাহলে ভোট হয়ে যাক। রাজ্যের কতজন পাকিস্তানে যেতে চায় দেখো। গণভোটে দেখা গেলো ১,১৯,০০০ ভোট পড়লো ভারতে যুক্ত হওয়ার পক্ষে আর মাত্র ৯১ টি ভোট পড়লো পাকিস্তানে যুক্ত হওয়ার পক্ষে। শেষে নবাব বাধ্য হয়ে জুনাগড় কে ভারতে যুক্ত করলেন। এখানে কূটনীতির মাধ্যমে কাজ হাসিল করলেন। ভারত স্বাধীন হওয়ার আগেই হায়দ্রাবাদের নিজাম স্বাধীন রাষ্ট্র বলে ঘোষণা দেন। হায়দ্রাবাদ হলো ভারতের পেট এবং খুব শক্তিশালী অঞ্চল। বল্লভভাই দেখলেন যে হায়দ্রাবাদ কে ভারতের বাইরে রাখা যাবে না। এদিকে হায়দ্রাবাদ পাকিস্তান কে অর্থ সাহায্য দিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে শক্তিশালী করে তুলেছিলো। বল্লভভাই হায়দ্রাবাদের নিজাম ও তাঁর উপদেষ্ঠা রিজভি কে ভারতে যুক্ত হওয়ার নির্দেশ দেন। নিজাম শক্তির জুড়ে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ভারত হায়দ্রাবাদ এ সেনা পাঠায়। মাত্র পাঁচ দিনে হায়দ্রাবাদ কে পরাজিত করে ভারত ভুক্ত করেন। এখানে শক্তি প্রদর্শন এর নীতি গ্রহণ করেন।

বহু বিতর্কিত জন্মু কাশ্মীর সে তো হরি সিং এর রাজত্ব ছিল তিনি জন্মু কাশ্মীর এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য কে কাজে লাগিয়ে একে সুইজারল্যান্ড এ পরিণত করতে চেয়েছিলেন। সেই জন্মু কাশ্মীর কে ভারতে অন্তরভুক্ত করতে বল্লভভাই ভিন্ন পথ অবলম্বন করেন। হরি সিং না পাকিস্তানে না ভারতে যুক্ত হলেন। তিনি পৃথক রাষ্ট্র গঠন করতে চাইলেন। কিন্তু বল্লভভাই কাশ্মীর কে ভারত ভুক্ত না করে ছাড়বেন না। সে ক্ষেত্রে "ধীরে চলো" নীতি অবলম্বন করলেন। ইতিমধ্যে পাকিস্তানের কাবুলিরা ১৯৪৭ সালের ২২ অক্টোবর কাশ্মীর আক্রমণ করেন। কাশ্মীরের মুসলমানেরা সে সময় পাকিস্তানের কাবুলিদের পক্ষ অবলম্বন করেন। হরি সিং পড়েন বিপদে। ঠিক সেই সময় বল্লভভাই তাঁর সচিব বি পি মেনন কে পাঠান কাশ্মীর। হরি সিং কে বলেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারত সেনা বাহিনী পাঠিয়ে দুই দিনে কাশ্মীর কে কাবুলি মুক্ত করে দেবে শুধু হরি সিং ভারত ভুক্তির সনদে সই করুন। Instrument of accession নিয়ে গিয়ে তাতে সই করান। কাশ্মীর ভারত ভুক্ত হয়ে যায় আর অমনি ভারত সেনা

পাঠিয়ে পাকিস্তানিদের হটিয়ে দেয়। এই সময় কাশ্মীর বিশেষ সুবিধা সম্পন্ন রাজ্যের দাবি করলে বল্লভভাই ৩৭০ ধারা প্রয়োগ করেন যাতে বলা হয় ভারতের রাষ্ট্রপতির অনুমতি নিয়ে ভারত সরকার যে কোন সময় এই বিশেষ সুযোগ হটিয়ে দিতে পারে। ঠিক এভাবে কূটনীতি, শক্তি প্রদর্শন, দুরদর্শীতার মাধ্যমে ভারত কে একসূত্রে গাথেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল।

*****

Only **Education** has the power to change **Destiny** !

#Educate your Girl Child

Growing SEED

Dharmanagar, Tripura North - 799250

topicsadvertising.com